সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর পত্নী এমিলিয়ের গভীর সম্পর্কের কথা নেতাজির জীবনের এক স্বল্পচেনা অধ্যায়। সুভাষ ও এমিলিয়ের যখনই সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটত নিয়মিত পত্রালাপের মধ্য দিয়ে পরস্পর যোগাযোগ রেখে চলতেন। নেতাজির সংগ্রামের সাথী এই নারী প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করতেন। এই বইতে লেখিকা এক সংগ্রামী নারীর নীরব আত্মত্যাগের কথা লিখেছেন, আর তুলে ধরেছেন এক মহান বিপ্লবী ও এক বিদেশিনীর অনন্য প্রেমকথা।

97622

এমিলিয়ে ও সুভাষ • কৃষ্ণা বসু

আনন্দ

এমিলিয়ে ও সুভাষ

এক অনন্য সম্পর্কের কাহিনি

কৃষ্ণা বসু

এমিলিয়ে ও সুভাষ

এক অনন্য সম্পর্কের কাহিনি

এমিলিয়ে ও সুভাষ

এক অনন্য সম্পর্কের কাহিনি

কৃষ্ণা বসু

আনন্দ

মূলগ্রন্থ: A True Love Story: Emilie and Subhas
by
Krishna Bose
প্রথম প্রকাশ: ২০১৬
NIYOGI BOOKS
Text and photographs © Krishna Bose

প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৭

"The Bengali edition published in agreement
with Niyogi Books, the original publisher."

© কৃষ্ণা বসু

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-93-5040-762-2

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১
থেকে মুদ্রিত।

EMILIE O SUBHAS: EK ANANYA SAMPARKER KAHINI
[Memoir]
by
Krishna Bose
Published by Ananda Publishers Private Limited
45 Beniatola Lane, Calcutta 700 009

অনিতার জন্য
ভালবাসা সহ

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

ইতিহাসের সন্ধানে
১৯৪৭: স্মৃতিবিস্মৃতি
এক নম্বর বাড়ি
চরণরেখা তব
পার্লামেন্টের অন্দরমহলে
যে তরণীখানি
হারানো ঠিকানা

নিবেদন

অনেকদিন ধরেই আমার মনে হত কোনও একদিন আমাকে আন্টি এমিলিয়ের জীবনকাহিনি এবং সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা লিখতে হবে। ১৯৭০ সাল থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আন্টির বিষয়ে আমি অনেক লেখা লিখেছি। আন্টি সেকথা জানতেন আর কিছু লেখা নিজে পড়েছেন। আমি যেদিন আন্টির মৃত্যুর পর ১৯৯৬ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় শোকবার্তা লিখলাম সেদিন নতুন করে আবার উপলব্ধি করলাম যে আন্টিকে নিয়ে বিশদ করে আরও বড় কোনও লেখা আমাকে লিখতে হবে। যেসব নারী ইতিহাসের পাতায় নিজের প্রাপ্য সম্মান পাননি রবীন্দ্রনাথ তাঁদের নাম দিয়েছেন 'ইতিহাসে উপেক্ষিতা'। ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্টি এমিলিয়ের অবদান ও আত্মত্যাগ মানুষের কাছে অজানা থেকে যাবে তা হয় না।

আমি যখন আমার ইতিহাসবিদ পুত্র সুগতর কাছে আমার মনের কথা জানালাম সে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হল আর আমাকে তাড়াতাড়ি লেখা শুরু করতে উৎসাহিত করতে লাগল। কিন্তু আমি লেখা শুরু করে উঠতে পারিনি, এরপর আমি অনেক বই লিখলাম— শিশিরের সঙ্গে পঁয়তাল্লিশ বছরের বিবাহিত জীবনের কথা *যে তরণীখানি* (২০০১)। এই বই শিশিরের মৃত্যুর ঠিক পরেই লেখা। এরপর আমার পার্লামেন্টারি

জীবনের কথা লিখলাম ইংরেজি বই *আউটসাইডার ইন পলিটিক্স* (২০০৮), আর বাংলায় *পার্লামেন্টের অন্দরমহলে* (২০০৯)। পরাধীন ভারতে ও পরে স্বাধীন ভারতে আমার ছেলেবেলা আর বড় হয়ে ওঠার কাহিনি *হারানো ঠিকানা* (২০১৪) এবং তার ইংরেজি *লস্ট অ্যাড্রেসেস* (২০১৫) তারপর প্রকাশিত হল। তবে যত বই লিখি না কেন, আন্টি এমিলিয়েকে নিয়ে আমায় একটা বই লিখতেই হবে একথা আমি সর্বক্ষণ মনের মধ্যে লালন করছিলাম।

শেষ পর্যন্ত ২০১৫ সালের গ্রীষ্মকালে আমি যখন কনিষ্ঠ পুত্র সুমন্ত্রর কাছে চার সপ্তাহের জন্য ছুটি কাটাতে গেলাম তখন আন্টির ওপর বইটি আমি লিখে ফেললাম। আমি চিরদিন আমার সব লেখা তা সে প্রবন্ধ হোক বা বই কাগজ কলম নিয়ে নিজের হাতে লিখে এসেছি। আন্টির ওপর বইটি আমি জীবনে প্রথম ল্যাপটপে টাইপ করে লিখলাম। সুমন্ত্র নিজে একজন রাষ্ট্রনীতিবিদ ও লেখক। প্রতিদিন সে আমার লেখার কাজে উৎসাহ দিয়ে যেত।

কলকাতার নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর কর্মীদের মধ্যে লেখার সময়ে নানাকাজে আমাকে সহায়তা করেছেন কার্তিক চক্রবর্তী, মনোহর মণ্ডল, সুখময় চৌধুরী, অনির্বাণ ভট্টাচার্য এবং অনির্বাণ চ্যাটার্জি। গৃহকর্ত্রী লেখার কাজে ব্যস্ত থাকার সময়ে বসুন্ধরা গৃহের কাজকর্ম সামলে রেখেছেন অমলা সিং আর রাখহরি মাহাত।

এই বইয়ে ব্যবহৃত বেশির ভাগ ছবি পারিবারিক অ্যালবাম থেকে গৃহীত আর কিছু ছবি নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর সংগ্রহশালা থেকে প্রাপ্ত।

লন্ডন
মহালয়া, ১২ অক্টোবর ২০১৫

কৃষ্ণা বসু

পুনশ্চ

"এমিলিয়ে ও সুভাষ" বইটি ইংরেজিতে প্রকাশিত হবার পর অনেকে বাংলায় বইটি পড়তে চেয়েছিলেন। তাঁদের অনুরোধ মনে রেখে একসময়ে বইটি নিজেই অনুবাদ করে দিলাম। যাঁরা বাংলায় পড়তে চান আশা করি তারা প্রসন্ন হবেন।

বই লেখার কাজে নেতাজি ভবন ও আমার 'বসুন্ধরা' গৃহের সকল কর্মী সহযোগিতা করেছেন। বাংলা পাণ্ডুলিপি তৈরিতে বিশেষ সাহায্য করেছেন সুজাতা মণ্ডল। পাণ্ডুলিপি স্তরে বইটি পুরো পড়েছেন অধ্যাপিকা ড. সর্বাণী গুপ্তু। সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আনন্দ পাবলিশার্স-এর সকলকে এবং বিশেষ করে সুবীর মিত্রকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

২১ অক্টোবর ২০১৬
আজাদ হিন্দ দিবস

কৃষ্ণা বসু
বসুন্ধরা
৯০ শরৎ বসু রোড
কলকাতা

এক রোদ্দুরে ঝলমল বিকেলবেলা আমরা জার্মানির আউগসবার্গ শহরে পৌঁছলাম। বাভারিয়ার (Bavaria) সুপ্রাচীন শহর আউগসবার্গের উপকণ্ঠে স্টাটবার্গেন নামে জনবসতির এক সুদৃশ্য ভিলার সামনে আমাদের গাড়ি থামল। দরজা খুলতেই সামনের হলঘরটিতে অনিতা আর পরিবারের সকলে আমাদের অভ্যর্থনা করবে বলে দাঁড়িয়ে আছে। পরস্পর আলিঙ্গন, হ্যালো— হা-ই চলছে তারই মধ্যে আমি চোখ তুলে দেখলাম দোতলায় সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের একান্ত ভালবাসার মানুষ আন্টি এমিলিয়ে। আন্টির পরনে ফুলফুল ছাপা ভারতীয় চেহারার একটি ড্রেস। নীচের দিকে তাকিয়ে খুব উত্তেজিত ভাবে আন্টি বলে উঠলেন— 'জানো তো, খুব শিগগিরই ষাট বছর পূর্ণ হতে চলেছে।'

'ষাট বছর? কীসের ষাট বছর?' অবাক হয়ে ওপর দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলাম।

'সুভাষের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার ষাট বছর,' বললেন আন্টি। চোখে মুখে আনন্দের অভিব্যক্তি। 'ভিয়েনাতে ১৯৩৪ সালের জুন মাসে প্রথম দেখা। সামনের বছর ১৯৯৪ সালের জুনে ষাট বছর পূর্ণ হবে আমাদের সেই প্রথম সাক্ষাতের।'

সিঁড়ির নীচে এক সমবেত উচ্ছ্বসিত কলরব। তবে তো সামনের বছর জুনে আসতেই হবে। এই ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে গ্র্যান্ড সেলিব্রেশন হবে, আমরা ঘোষণা করলাম।

সেদিন সারাদিন ধরে ফ্রান্স থেকে জার্মানি দীর্ঘ জার্নি করে আমরা আউগসবার্গে পৌঁছেছি। ষাট বছর পূর্তি উৎসবের আগের বছর অর্থাৎ ১৯৯৩-এ। আমাদের আগমন কিন্তু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

আমি আর শিশির সে বছর গ্রীষ্মের অবকাশে ইউরোপে ছিলাম। আমাদের পুত্র সুগত তখন তার কাজের জন্য ফ্রান্সে লেক আনেসির (Annecy) তীরে একটি ছবির মতো সুন্দর জায়গায় রয়েছে। শিশিরের শরীর ভাল নেই, বিশ্রামে আছেন। আন্টি রোজ ফোন করেন। বলেন, 'একবার আমার কাছে ঘুরে যাও। আমি শিশিরকে দেখতে চাই।' আমরা প্রতি বছরই গ্রীষ্মে একবার আন্টিকে দেখতে যেতাম। আগের বছর অর্থাৎ ১৯৯২-তে বাধা পড়েছিল। সেবার লন্ডনে শিশিরের হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হওয়াতে হাসপাতালে বেশ কিছুদিন কাটাতে হল। আমাদের লন্ডন থেকে আউগসবার্গ যাত্রা বাতিল করতে হয়েছিল। সুগত ঠিক করলে সে গাড়ি ড্রাইভ করে লেক আনেসি থেকে আউগসবার্গ যাবে। এরোপ্লেনে যাওয়া মানে বিমানবন্দরে মাইলের পর মাইল হাঁটা, বার বার প্লেনে থেকে ওঠা-নামা করা। তার চাইতে গাড়ি করে যাওয়া শিশিরের পক্ষে আরামপ্রদ হবে।

সকালে রওনা হয়ে আমরা পথে সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরে লাঞ্চের জন্য থামলাম। বার্ন শিশিরের প্রিয় শহর। মেডিকেল ছাত্র হিসেবে সুইজারল্যান্ডে শিশু-চিকিৎসার পাঠ কিছুদিন বার্ন শহরে নিয়েছিলেন। এরপর লেক কনস্টানস্ পার হলাম স্টিমারে। গাড়িসুদ্ধ তুলে নিল। ওপারে নেমে আবার গাড়িতে যাত্রা। দু'ধারে গাছের সারি দেওয়া সুন্দর পথ, মাঝে মাঝে ছোটখাটো পাহাড়, সুন্দর হ্রদ, কোথাও বা দু'পাশে বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তর, মাঝে হলুদ সরষে ফুল আলো করে আছে। গ্রীষ্মকালের ইউরোপ বেশ সতেজ, সুন্দর।

সন্ধ্যার পর সবাই ডিনার খেতে বসলাম। অনিতা যেমন সর্বদাই করে নানাবিধ পদ চমৎকার রান্না করেছে। আমরা সবাই গল্পগুজব করছি, এবার তো দু'বছর দেখা হয়নি, অনেক কথা জমে আছে। আন্টি কেমন যেন চুপচাপ, এটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। আমরা জানতাম উনি শিশিরের শরীর খারাপ নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন আছেন। আমরা কিন্তু জানতাম না এই যে উনি বারবার— আমার কাছে ঘুরে যাও— বলছিলেন তার এক বিশেষ কারণ আছে। খাওয়া শেষ হয়েছে। অনিতা সবে ডেজার্ট পরিবেশন করবে, এমন সময় আন্টি হঠাৎ মুখ খুললেন। টেবিলের চারিদিকে একবার চেয়ে উনি ঘোষণা করার মতো বললেন, 'এখন তোমরা ফ্যামিলি উপস্থিত আছ, আমি একটা কথা বলতে চাই।' অনিতা বললেন, 'মা তুমি এমন সিরিয়াস মুখ করে বলছ! কী ব্যাপার, কোনও এনগেজমেন্ট ঘোষণা করবে নাকি।' আমরা সকলে হেসে উঠলাম। আন্টি কিন্তু গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপর শিশিরের দিকে ফিরে বললেন— শিশির, তোমাকে আমি অনুমতি দিচ্ছি এতদিন ধরে তোমার আংকল আমাকে যত চিঠি লিখেছিলেন, যা আমি এতকাল নিতান্ত নিজস্বভাবে রক্ষা করে এসেছি— সে সব চিঠিপত্র তুমি প্রকাশ করতে পারো।

কয়েক মুহূর্তের বিস্মিত নীরবতা ভেঙে টেবিলের চারপাশ থেকে এক আনন্দধ্বনি উঠল। অনিতা, তার স্বামী মার্টিন, তাদের মেয়ে মায়া, শিশির, সুগত, আমি, সকলে তাঁর এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালাম। সযত্নে রিবন দিয়ে বাঁধা একগুচ্ছ চিঠি তিনি এতকাল প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে এসেছেন, আজ সেই অমূল্য সম্পদ তিনি বাইরের বিশ্বের মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিতে প্রস্তুত।

আমার মনে পড়ছিল যখন আমরা ভিয়েনাতে আন্টির বাড়িতে থাকতে

যেতাম সে সব দিনের কথা। আন্টি আমাকে তাঁর নিজের শোবার খাটটি ছেড়ে দিতেন। রাতের অন্ধকারে, সেই শয্যায় শুয়ে আমি দেখতে পেতাম পাশের বেডসাইড টেবিলের নীচের তাকে রিবনে বাঁধা একগোছা চিঠি। রাতের নির্জনতায় সেই রিবনে বাঁধা চিঠির গোছার দিকে চেয়ে আমি মনে ভাবতাম এক ভারতীয় বিপ্লবী আর এক বিদেশিনী তরুণীর মধ্যে কেমন করে এক অনন্য, অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

আন্টি এমিলিয়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়

আন্টি এমিলিয়ের সঙ্গে আমার প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয় হল ১৯৫৯-এর ডিসেম্বরে বড়দিনের উৎসবের সময়ে। অবশ্য তার আগেই চিঠিপত্রের মাধ্যমে আমাদের যথেষ্ট চেনা-জানা হয়ে গিয়েছিল। শিশিরকুমার বসুর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরে। তার আগে আগস্ট মাসে আমাদের বিবাহ স্থির হওয়া মাত্রই উডবার্ন পার্কের বাড়ি থেকে খুব তাড়া এল আমার একটি ছবি যেন তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কারণ ভিয়েনাতে কাকিমা অধীর আগ্রহে ছবির জন্য অপেক্ষা করছেন। ফোটোগ্রাফার সুনীল জানা তাদের বাড়িতে এক সন্ধ্যায় আমার ও শিশিরের একটি খুবই ইনফর্ম্যাল ছবি তুলেছিলেন। সেটি পাঠিয়ে দেওয়া হল।

বিবাহের সময়ে আন্টির কাছ থেকে একটি সুন্দর ভিয়েনার হাতে পরবার ব্রেসলেট উপহার এল। সেই সঙ্গে চিঠিতে শিশিরকে লিখলেন— তোমার মা ও বাবা যেমন সুখী হয়েছিলেন তোমরাও যেন তেমনি সুখী হও।

মা ও বাবা বিভাবতী ও শরৎচন্দ্র বসু সত্যিই সুখী দম্পতি ছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বে থাকার ফলে তাঁদের জীবন ছিল সংগ্রামের ও নানা দুঃখকষ্টে পূর্ণ। আমি যখন আমার শাশুড়িমাতা বিভাবতীর কথা ভাবি, তখন কীভাবে তিনি কঠিন সময়ে

পরিবারের সব দায়িত্ব বহন করেছিলেন ভেবে আশ্চর্য হই। তাঁর স্বামী শরৎচন্দ্র বসু দীর্ঘ আট বছর ইংরেজের কারাগারে বন্দি, চার বছর ১৯৩২ থেকে ১৯৩৫, আবার ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫। পুত্র শিশিরকুমারের নানাধরনের বন্দি জীবন। কখনও কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে, কখনও বা দিল্লির লালকেল্লা বা লাহোরের কুখ্যাত লাহোর ফোর্ট-এর কুঠুরিতে একাকী বন্দিজীবন, সলিটারি কনফাইনমেন্ট। প্রতিবারই প্রাণ সংশয়। মা বলতেন, ওকে তো মেরেই ফেলেছে, আমাকে জানিয়ে দিলেই পারে। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলে পর ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বরে শিশির মুক্তি পান। তখন ছিলেন পঞ্জাবের লায়লপুর (বর্তমান ফৈজলাবাদ) কারাগারে।

আর দেবর সুভাষচন্দ্রের জন্য দুশ্চিন্তার তো কোনও অন্ত নেই। ত্রিশের দশকে বেশ কিছুদিন সুভাষচন্দ্র ইউরোপে নির্বাসিত ছিলেন। আর দেশে থাকলে কোনও-না-কোনও কারাগারে বন্দিজীবন। ১৯৪১-এ এলগিন রোডের বাড়ি থেকে তাঁর মহানিষ্ক্রমণ। শিশিরকে রথের সারথি করে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন। তারপর প্রথমে ইউরোপে পরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে তাঁর তুমুল কর্মকাণ্ড। দূর থেকে প্রবাসী দেবরের জন্য মেজোবউদির উদ্বেগ।

অতএব স্বীকার করতেই হবে আমার ও শিশিরের বিবাহে আন্টি এমিলিয়ের আশীর্বাণী আমার যেমন হৃদয় স্পর্শ করেছিল, তেমনি বেশ দুর্ভাবনারও কারণ হয়েছিল।

সেবছর ১৯৫৯ সালে ভিয়েনাতে যাকে বলে 'হোয়াইট ক্রিসমাস' অর্থাৎ সব কিছু বরফে ঢাকা। ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, গির্জার উঁচু চূড়া সব বরফের সাদা চাদরে ঢাকা। আন্টির বাস্টিয়েন-গাসের

এমিলিয়ে ও সুভাষ, ১৯৩০-এর মাঝামাঝি সময়।

ভিয়েনায় ক্রিসমাসে, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৫৯। বাঁ দিক থেকে: শিশির, অনিতা, এমিলিয়ে, ছোট্ট সুগত, মেয়ে শর্মিলাকে কোলে নিয়ে কৃষ্ণা। পেছনে দাঁড়িয়ে ওমামা।

ভিয়েনায় অনিতা ও শিশির, ডিসেম্বর ১৯৫৯।

এমিলিয়ে ও কৃষ্ণা, ভিয়েনায় ২৬ ডিসেম্বর ১৯৫৯।

সুগতকে কোলে নিয়ে অনিতা, কৃষ্ণা, এমিলিয়ে ও শিশির। ডিসেম্বর ১৯৫৯, ভিয়েনা।

অনিতার ফেনসিং-এর প্রতিপক্ষ রূপে এমিলিয়ে।

বাঁদিক থেকে বসে: সুগতকে নিয়ে কৃষ্ণা, এমিলিয়ে, শিশু শর্মিলাকে কোলে নিয়ে অনিতা। বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে: সুব্রত ও শিশির। ভিয়েনায় ১৯৫৯-এর ডিসেম্বরে।

অনিতা ভিয়েনায়, ১৯৫৯।

ভারতবর্ষে অনিতা, ১৯৬১।

এমিলিয়ে ও কৃষ্ণা, ভিয়েনায় সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

সুভাষচন্দ্র বসু, বার্লিনে অরল্যান্ডো মাৎসোটা রূপে পৌঁছনোর সময়, এপ্রিল ১৯৪১।

(Bastiengesse) বাড়ির বসার ঘরে ফায়ার প্লেসে কাঠের আগুন জলছে। আন্টি ক্রিসমাস ট্রি সাজাতে ব্যস্ত। অনিতার বয়স তখন সতেরো, সে আমার শিশুকন্যাকে দেখভাল করছে। আমার তিন বছরের বালক পুত্র ঘরের চারিদিকে দৌড়ে বেড়াচ্ছে আর তার পিছনে চলেছেন ওমামা (অর্থাৎ দিদিমা) হাতে একটা প্লেটে পালং শাক আর মাংসের কিমার বল। তিনি ডিনারটা খেয়ে নেবার জন্য কাকুতি মিনতি করছেন। তাঁর জার্মান ভাষায় কথাবার্তা শুনে বালক সচকিত। তার সদর্প ঘোষণা, আমি তিনটি ভাষা জানি, ইংলিশ, বেঙ্গলি অ্যান্ড হিজিবিজি। শিশির আর আমার দেবর সুব্রত গল্পগুজব করছে। সে মিউনিখ থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে এসেছে। আমি আন্টির সঙ্গে ক্রিসমাস ট্রি সাজানোতে হাত লাগিয়েছি। আন্টিকে দেখে মনে হচ্ছে খুব আনন্দে আছেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'কৃষ্ণা— কতদিন পরে ক্রিসমাসের সময় বাড়িতে একটা ফ্যামিলি গ্যাদারিং হল!'

তার পরদিন ২৬ ডিসেম্বর ছিল। আমার আর আন্টির দু'জনেরই জন্মদিন। ২৬ ডিসেম্বরের আর-এক নাম বক্সিং-ডে। আমি আর আন্টি দু'জনেই একই দিনে জন্মেছি, অবশ্য কুড়ি বছরের তফাত। আন্টির সে বছর উনপঞ্চাশ হল আর আমার উনত্রিশ। আমরা ঠিক করলাম আজকে বাইরে কোথাও খাওয়াদাওয়া করব। বাড়ির কাছে একটা রেস্তোরাঁ ঠিক করা হল, কারণ সঙ্গে দুটি বাচ্চা আছে। আমরা যতক্ষণ খাওয়া দাওয়া গল্পগুজব করলাম, আমার শিশুকন্যা একটা সোফাতে ঘুমিয়ে রইল। আর বালকপুত্রকে রেস্তোরাঁর কর্মীরা কিচেনে নিয়ে গেল। একটু পরে চিফ শেফ অর্থাৎ প্রধান রাঁধুনির সঙ্গে তার আবির্ভাব, তার মাথায় তখন শেফ-এর ধবধবে সাদা টুপি।

এরপর আমি কতবার যে আন্টির কাছে গিয়েছি, প্রথমে ভিয়েনাতে তারপর আউগসবার্গে কিন্তু কখনওই শীতকালে যাওয়া হয়নি ফলে একসঙ্গে জন্মদিনের আনন্দ করা হয়ে ওঠেনি। প্রতি বছর টেলিফোনে আলাপচারিতা করে সন্তুষ্ট থাকতে হত। আমরা দু'জনেই তখন সেই ১৯৫৯-এর হোয়াইট ক্রিসমাসের সময়ে একসঙ্গে জন্মদিন পালন করার কথা মনে করতাম।

আন্টির বাড়ির কিচেনে বেসিনে বাসন ধুতে ধুতে গল্প করতাম। তখনও ডিশ-ওয়াশার-এর যুগ আসেনি। আন্টি বলতেন, "কৃষ্ণা— ওই আইসক্রিম কাপগুলো সাবধানে ধোবে। ওই কাপ তোমাদের আঙ্কেলের (সুভাষ) সঙ্গে প্রথমবার কার্লোভিভারি যখন যাই তখন কিনেছিলাম। তারপর আমি তো একটা ভেঙে ফেলেছিলাম। পরের বার যখন গেলাম একটা কাপ আবার কিনলাম।" কার্লোভিভারি বা কার্লসবাদ চেকোশ্লোভাকিয়ার বিখ্যাত স্বাস্থ্যকর শহর, স্পা (spa) বা উষ্ণ জলের প্রস্রবণের জন্য বিখ্যাত। সবাই শরীর সারাতে যায়। সুভাষচন্দ্রও স্বাস্থ্যের উন্নতি ও বিশ্রামের জন্য বেশ কয়েকবার চেকোশ্লোভাকিয়ার (বর্তমান চেক রিপাবলিক) এই সুন্দর শহরে এসেছেন।

আন্টি এমিলিয়ে ও নেতাজির জীবনের ছোটখাটো গল্প শোনার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম। কিন্তু আন্টি খুব কিছু বলতেন না। নানারকম গল্পগুজবের মধ্যে হঠাৎ হয়তো একটা ঘটনা দৈবাৎ বলে ফেলবেন, আমি তার অপেক্ষায় থাকতাম।

সেবার আমরা আন্টিকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলাম, সামনের বছর যেন অনিতাকে আমাদের কাছে ভারতে পাঠান। ওর হাইস্কুল শেষ হবে, আঠারো বছর বয়স হবে। অনিতার খুব ইচ্ছে ভারতে আসবে। আন্টির

ঘোরতর আপত্তি। উনি বললেন, অনিতার কোনও ধারণা নেই ভারতবাসী নেতাজিকে কী চোখে দেখে। লোকের উচ্ছ্বাস দেখলে আর জিন্দাবাদ শুনলে ওর মাথা ঘুরে যাবে।

শেষ পর্যন্ত ১৯৬০ সালে অনিতা ভারতে এসেছিল। সে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছিল। দেশে যখন যেখানে গিয়েছে মানুষের অজস্র ভালবাসা পেয়েছে। নেতাজির কন্যা হিসেবে পাওয়া সেই ভালবাসা সে সহজাত বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। সে আপ্লুত হয়েছে কিন্তু তার মাথা ঘুরে যায়নি।

ভিয়েনার সেই তুষারাবৃত ক্রিসমাসের সময় থেকে আমার আর আন্টি এমিলিয়ের মধ্যে এক আজীবন বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল। ভিয়েনার দিন শেষ হয়ে এলে আন্টি আর অনিতা আমাদের রেল স্টেশনে গুডবাই বলতে এল। আমার মনে পড়েছিল, এই ভিয়েনা রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই আমি আন্টি আর অনিতাকে প্রথম দেখি। ওরা আমাদের অভ্যর্থনা করতে এসেছিল। আমরা মিউনিখ থেকে এসে ট্রেন থেকে নেমেছি। দেখলাম ভিড় ঠেলে দু'জনে ছুটতে ছুটতে আসছে। কাছে এসেই আন্টি জড়িয়ে ধরলেন, মনে হল যেন কতদিনের চেনা। আজ আবার আমরা ভিয়েনা থেকে ট্রেনে চেপে রোমের পথে রওনা হয়ে পড়লাম। পিছনে রেখে গেলাম আপনজনেদের সঙ্গে কাটানো দিনের আনন্দময় স্মৃতি।

আমরা চলে আসার আগে আন্টিকে রাজি করতে পেরেছিলাম যে, পরের বছর অনিতা আমাদের কাছে আসবে। বসু পরিবারকে আন্টি নিতান্ত আপন বলে মনে মনে গ্রহণ করেছিলেন। পরিবারের প্রতিটি সদস্যর জন্য ছিল তাঁর স্নেহ, যদিও বেশির ভাগ সদস্যকে তিনি হয়তো

চোখেও দেখেননি। তবে শিশিরের প্রতি কোথায় যেন তাঁর একটু বিশেষ ভালবাসা ও নির্ভরশীলতা ছিল। কোনও গুরুতর সিদ্ধান্ত নেবার আগে একবার কথা বলতেন। অনিতা প্রথমবার ভারতে যাবে, আন্টির মনে খুব চিন্তা। এই যাত্রার পরিকল্পনা, সব কিছু যেন মসৃণ ভাবে হয় তার জন্য উনি শিশিরের উপর নির্ভর করেছিলেন।

অনিতা ভারতে এল

অনিতা কলকাতায় উডবার্ন পার্কের বাড়িতে আমাদের সঙ্গে থাকতে এল। ডিসেম্বর মাস, ১৯৬০ সাল। উডবার্ন পার্কের বাড়িটি আমার শ্বশুরমহাশয় শরৎচন্দ্র বসু তৈরি করেছিলেন ১৯২৭ সালে। আর অদূরে এলগিন রোডের উপর ওঁদের পৈতৃক বাসভবন। সুভাষের পিতৃদেব জানকীনাথ বসু ১৯০৯ সালে এই বাড়িটি নির্মাণ করেন। এলগিন রোডের বাড়ি এখন নেতাজি ভবন নামে পরিচিত আর উডবার্ন পার্কের বাড়ির নাম শরৎ বসু ভবন। অনিতার জন্য আমি আমাদের চিলড্রেনস রুম, অর্থাৎ যে ঘরে আমার ছেলে ও মেয়ে থাকত সেটি গুছিয়ে ফেললাম। দুই বাচ্চাকে আমাদের শোবার ঘরে নিয়ে গেলাম। মাঝখানে মস্ত হলঘর যা কিনা আমাদের বসবার ঘর। এই যে ঘরটিকে আমরা চিলড্রেনস রুম বলি তার একটা ইতিহাস আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে এই ঘরটি অতিথিদের জন্য ব্যবহৃত হত। শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র দু'জনেই সে সময়ে অনেক বিশিষ্ট অতিথিদের বাড়িতে এনে রাখতেন। তখন এই ঘর ব্যবহৃত হত। সে সব সময়ে উডবার্ন পার্ক-এর বাড়িতে মহাত্মা গাঁধী, জওহরলাল নেহরু, সরোজিনী নাইডু আরও অনেকেই এসে থাকতেন। এক নম্বর উডবার্ন পার্ক তখন জাতীয় রাজনীতির, বিশেষ করে বাংলার রাজনীতির কেন্দ্র ছিল। গাঁধীজি এসে দোতলায় ছিলেন। আর একবার তিনতলাতেও ছিলেন। তিনতলার ছাদে গাঁধীজির প্রার্থনা সভা বসত।

শুনেছি বাড়িতে খুব ভিড় হত। আর বাইরে রাস্তায় জনতা গাঁধী-মহারাজ কি জয় ধ্বনি দিত। জওহরলাল নেহরু যখনি আসতেন, একতলার অতিথি ঘরে অর্থাৎ আমাদের সময়ের চিলড্রেনস রুমে থাকতেন। পুরাতন ভৃত্যেরা বহুদিন পরেও মাঝে মধ্যে ঘরটিকে 'পণ্ডিতজির ঘর' বলে উল্লেখ করত। চিলড্রেনস রুম-এর অতিথি ভাগ্য ভাল ছিল। আমাদের কাছেও এসে থেকেছেন নেতাজির সহযোদ্ধারা আবিদ হাসান, এস এ আয়ার। হরিবিষ্ণু কামাথ থেকে ভগতরাম তলোয়ার কে-না থেকেছেন। আমাকে মাঝে মাঝেই বাচ্চাদের আমাদের শোবার ঘরে স্থানান্তরিত করতে হত। যাহোক ১৯৬০ সালের শীতকালে অনিতার জন্য সেই শোবার ঘর আমি সাজিয়েছিলাম। শিশির ও আমার সংসার তখন একতলাতেই ছিল। ডানদিকে বড় ঘরটি ছিল শিশিরের চেম্বার, রুগিরা অপেক্ষা করতেন সামনের বসবার জায়গাটিতে। দোতলা ও তিনতলায় থাকতেন আমার মেজো ও বড় ভাশুর। দেবর তখনও জার্মানিতে। অনিতার থাকার সময়ে অনেকদিন আমরা পরিবারের সকলে একসঙ্গে রাতের ডিনার দোতলার প্রশস্ত খাবার ঘরে গল্পগুজব করে একসঙ্গে খেতাম। আমি তখন কলেজে অধ্যাপনা করি। অনিতা থাকার সময়ে সারাদিন বাড়িতে লোকজনের ভিড় হত। যখন-তখন অতিথি অভ্যাগত চলে আসেন। আমি কলেজ থেকে কিছুদিন ছুটি নিলাম। তা না হলে পেরে উঠছিলাম না। অনিতাও খুব ব্যস্ত। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে হয়। অনেক সভাসমিতিতে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ থাকে। সাংবাদিকেরা আসেন সাক্ষাৎকার নিতে। সব কিছু মিলে খুবই জমজমাট।

অনিতা যখন ভারতে এল, তখন বসুবাড়ির আগের প্রজন্মের, সুভাষচন্দ্রের সাত ভাইয়ের মধ্যে দু'জন জীবিত আছেন। ওঁরা আট ভাই

ছিলেন, একজন অল্প বয়সে মারা যান। তখন জীবিত আছেন জানকীনাথের তৃতীয় পুত্র সুরেশচন্দ্র বসু, আমরা তাঁকে সেজোকাকাবাবু বলে ডাকি। আর আছেন তখন সবচেয়ে ছোট শৈলেশচন্দ্র বসু। তিনি আমাদের খুব প্রিয় কাকাবাবু, বম্বেতে থাকেন। দেশে এলে অনিতা সুভাষচন্দ্রের দুই ভ্রাতার সঙ্গে কিছু সময় কাটাবে এমন কথা ঠিক হল। সেজোকাকাবাবুকে নিয়ে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, পরে অবশ্য সমাধান হয়ে যায়। তবে বম্বেতে কাকাবাবু ও কাকিমার (ভক্তিলতা) সঙ্গে অনিতা খুব ভালই ছিল। ওঁরা ওকে দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য শহরে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই এক সফরে ওঁরা বাঙ্গালোর (এখন বেঙ্গালুরু) গিয়েছিলেন। সেখানে নেহাত ঘটনাচক্রে এক জার্মান তরুণের সঙ্গে অনিতার আলাপ হয়। কাকিমা পরে আমাকে বলেছিলেন, দু'জনে জার্মান ভাষায় খুব গল্প করেছিল। ছেলেটি কটকের কলেজে পড়াশুনো করেছিল। কটক সুভাষচন্দ্রের জন্মস্থান। তারপর বাঙ্গালোরে একটি বেসরকারি সংস্থায় জনসেবামূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল। এই দৈবাৎ দেখা হওয়া থেকে শুরু করে পরে ভিয়েনাতে দু'জনের বেশ বন্ধুত্ব হয়ে যায়। এর অল্প কয়েক বছর পরে অনিতা মার্টিন পাফ নামে সেই যুবককে বিবাহ করল। আমরা পরিবারে একটি হাসিখুশি মিশুকে সদস্য পেলাম। সব কিছুতে নিয়তির একটা হাত থাকে। সুভাষচন্দ্রের কন্যার সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ স্বামীর ভারতের মাটিতে দেখা হওয়া তেমনি এক ঘটনা।

অনিতা কলকাতা এসে পৌঁছবার কয়েকদিন আগে সেজোকাকাবাবু সুরেশচন্দ্র আমাদের এক প্রচণ্ড অপ্রস্তুত পরিস্থিতিতে ফেলে দিলেন। এই ঘটনাটার সামান্য একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আন্টি এমিলিয়ে ও সুভাষচন্দ্র তাঁদের দু'জনের সম্পর্ক এবং বিবাহের কথা বিশ্বের কাছে গোপন রাখবেন

এমনি এক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কেন এই সিদ্ধান্ত তা তাঁরাই জানেন। এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তের জন্য তাঁদের দু'জনকেই যথেষ্ট দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে। অপরদিকে এই গোপনীয়তা এক অকারণ বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। দেশের কিছু মানুষ এতে সংশয় প্রকাশ করেছেন। সুভাষচন্দ্র তাঁদের কাছে দেবতা, সাধারণ মানুষ, নন। তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন জন্মভূমির জন্য। তাঁর মতো অসাধারণ ব্যক্তি কোনও নারীকে ভালবেসে বিবাহ করবেন এ যেন মেনে নেওয়া কঠিন। এ ধরনের অযৌক্তিক মানুষ সংখ্যায় কম ছিলেন কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসী ছিলেন।

এক সকালে আন্টি এমিলিয়ের কাছ থেকে শিশিরকুমার বসুর নামে একটি টেলিগ্রাম এল। আন্টি জানালেন, এইমাত্র উনি সুরেশচন্দ্রের কাছ থেকে একটি টেলিগ্রাম পেয়েছেন যে, অনিতার দেশে আসার পরিকল্পনা যেন এখনই বাতিল করে দেওয়া হয়, কারণ তাকে নিয়ে একটি বিতর্কের সূচনা হয়েছে। এই খবরে উডবার্ন পার্কের বাড়ির সকলে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সমগ্র বসু পরিবার, তার সকল শাখা-প্রশাখা অনিতাকে সাদরে অভ্যর্থনা করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তাদের মধ্যে সুরেশচন্দ্রের নিজের পুত্রকন্যারাও আছেন। আমরা জানতাম একমাত্র একজন জ্যাঠতুতো দাদা, সতীশচন্দ্রের পুত্র এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। শোনা গেল তিনি খুব সম্ভবত সেজোকাকাবাবুর মনে কিছু প্রভাব সঞ্চার করেছেন। আরও লজ্জাকর যা ঘটেছে, সুরেশচন্দ্র সব খবরকাগজে এক বিবৃতি পাঠিয়ে দিয়েছেন যে, তিনিও বিবাহে বিশ্বাস করেন না। শিশির প্রথমেই আন্টিকে ফিরে টেলিগ্রাম করলেন। তখন তো আর ই-মেলের যুগ নয়, টেলিগ্রাম চালাচালি ছাড়া উপায় নেই। শিশির লিখলেন, অনিতার ভারতে আসার পরিকল্পনা যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে, আন্টি যেন কোনও চিন্তা না করেন।

পরের ধাপ হল সব জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো ভাইদের নিয়ে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে আমার একতলার বসবার ঘরে রীতিমতো কনফারেন্স বসল, ড্যামেজ কন্ট্রোল কীভাবে করা যায়। সকলে এসেছেন, সুরেশচন্দ্রের পুত্ররা উপস্থিত। তাঁরা কিঞ্চিৎ লজ্জিত। বসুবাড়ি সাধারণ ভাবে একটু গোঁড়া এবং পুরুষতান্ত্রিক। অবশ্য ব্যতিক্রমী অনেকে আছেন। সভায় শুধু ছেলেদের দেখছি, মেয়েরা নেই। এমন সময়ে আমাকে বেশ আশ্চর্য করে দিয়ে আমার ভাসুর অমিয় আমাকে ডেকে পাঠালেন। সভায় আমি একমাত্র মহিলা। উনি আমাকে বললেন, তুমি তো লেখালেখি করো, খবর-কাগজে তোমার চেনাশুনো আছে। দেখো সুরেশচন্দ্রর এই বিবৃতি প্রকাশ বন্ধ করতে পারো কি না। সংবাদপত্র জগতে আমার সামান্য কিছু পরিচিত বন্ধু ছিলেন এ কথা ঠিক। আমি একটি কাগজে কলা-সমালোচকের কাজ করি। মাঝে মধ্যে অন্য কোনও পত্র-পত্রিকায় এটা-সেটা লিখে থাকি।

প্রথমেই আমি 'স্টেটসম্যান' কাগজে চঞ্চল সরকারকে টেলিফোন করলাম। 'স্টেটসম্যান' সে সময়ের সবচাইতে প্রভাবশালী ইংরেজি দৈনিক। চঞ্চল সরকার আমাকে বললেন, দেখো কৃষ্ণা, 'স্টেটসম্যান' একটি দায়িত্বশীল সংবাদপত্র। তুমি না বললেও আমরা এ ধরনের খবর ছাপতাম না। এরপর তখনকার জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক 'যুগান্তর', বার্তা সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন বসু। দক্ষিণাদা আমাকে কথা দিলেন। তারপর বললেন, একটু দেখো 'আনন্দবাজার' ওদের প্রতিদ্বন্দ্বী, যেন না-ছাপে। আনন্দবাজার গোষ্ঠী আমাদের নিশ্চিন্ত করল। 'অমৃতবাজার'কে কে বলল আমার মনে পড়ছে না। এই ক'টি প্রধান খবর-কাগজ ছিল। সুরেশচন্দ্রের পুত্র অরবিন্দ ছোট, ছোট দু'-একটি কাগজের সঙ্গে কথা বলল। পরদিন সকালে দেখা গেল একমাত্র 'বসুমতী'— তখন খুবই তুচ্ছ— ছাড়া আর কেউ প্রকাশ

করেননি। এই কাহিনির একটি অদ্ভুত অথচ মধুরেণ সমাপয়েৎ হয়েছিল। সুরেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র রঞ্জিৎ, ডাক নাম কার্তিক, গড়িয়াতে একটি বাড়ি করেছিলেন। আমরা তাঁকে সেজদা বলে ডাকতাম। সেই বাড়িতে উনি বাবা-মা, ভাই বোন সকলকে নিয়ে বসবাস করতেন। অনিতা তাঁদের বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে গেল। গড়িয়ার বাড়ি থেকে অনিতা আমাকে ফোন করে বলল, সেজোকাকাবাবু অর্থাৎ সুরেশচন্দ্র তার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল হয়ে আছেন, আদরযত্ন করে মাছের ঝোল ভাত খাওয়াচ্ছেন। এই খবরে অনিতার মতো আমিও বিস্মিত হয়েছিলাম। কিন্তু সেই সঙ্গে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে ও পরিবারের সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলাম। যাক, শেষ পর্যন্ত উনিও তা হলে মেনে নিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু অনিতাকে তাঁর সঙ্গে দিল্লিতে এসে কয়েকদিন কাটিয়ে যেতে আমন্ত্রণ করেছেন। অনিতা সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দিল্লিতে গেল। বিমানবন্দর থেকে তাকে নিয়ে আসার জন্য নেহরু রাজীব গাঁধীকে পাঠিয়েছিলেন। রাজীবের তখন নেহাতই অল্পবয়স, অনিতার থেকে একটু ছোট। রাজীবের সঙ্গে অনিতার আবার দেখা হল অনেকদিন পর, ১৯৮৭ সালে। রাজীব তখন প্রধানমন্ত্রী। সেই সাক্ষাতের সময় রাজীব তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আচ্ছা আমি তো নেহরুর নাতি, তুমি কি নেতাজির নাতনি? অনিতা তার ভুল ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল— আমি তোমার থেকে এক প্রজন্ম সিনিয়ার। দিল্লিবাসের সময় নেহরু অনিতাকে খুবই স্নেহের চোখে দেখেছিলেন এবং তার দিল্লির দিনগুলি যাতে আনন্দে কাটে তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা করেছিলেন।

যেসব আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব অনিতাকে আন্তরিকভাবে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হবে বাসন্তীদেবীর। তিনি

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পত্নী, সুভাষ (এবং শরৎ) তাঁকে মাতৃসমা মনে করতেন। সুভাষ তাঁকে 'মা' বলেই ডাকতেন। দেশবন্ধু ছিলেন সুভাষ ও শরতের রাজনৈতিক গুরু। বাসন্তীদেবী অনিতাকে দেখে স্নেহে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। আমার খুব সৌভাগ্য বাসন্তীদেবী আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। প্রথম দেখা হওয়ার পর থেকেই আমার আর ঠাকুমার দু'জনেরই দু'জনকে খুব ভাল লেগে যায়। নফর কুণ্ডু রোডের বাড়িতে বসে ঠাকুমা আমাকে শরৎ ও সুভাষ এবং দেশবন্ধুর কত যে গল্প শুনিয়েছেন। একবার বলেছিলেন ত্রিশের দশকে ইউরোপ থেকে দেশে এলে পর উনি সুভাষকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমার যেন ভিয়েনা শহরটা বেশ ভাল লাগে। ওখানে বিশেষ কেউ আছে নাকি!' ঠাকুমা বলেছিলেন উনি বেশ আশ্চর্যই হলেন, যখন সুভাষ সলজ্জভাবে না-না বলে ব্যাপারটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল। এদিকে আন্টি এমিলিয়ে, একবার যখন ওঁর সঙ্গে ভিয়েনাতে আছি, তখন বললেন, 'সুভাষ আমাকে বলেছিল, জানো তো বাসন্তীদেবী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে ভিয়েনাতে আমার 'স্পেশাল' কেউ আছে।' অনিতাকে দেখে ঠাকুমা আবেগে অভিভূত হয়ে আপন বলে গ্রহণ করলেন।

আরও একজন অনিতাকে অন্তর থেকে মেনে নিয়েছিলেন। তিনি সুভাষচন্দ্রের ছোট বোন, আমাদের ছোট পিসিমা কনকলতা। আমার বিয়ের পর ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরে আমি যখন নববধূ রূপে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে পদার্পণ করলাম, তখন আনুষ্ঠানিক বধূবরণের কাজ করেছিলেন ছোট পিসিমা। আমাদের গাড়ি যখন উডবার্ন পার্কের বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়াল তখন খুব সুন্দর সানাই বাজছিল। মেয়েরা লাল বেনারসি পরে কলসি থেকে জল গাড়ির চাকায় ঢেলে দিল। এ হল এক ধরনের শুদ্ধিকরণ।

শাঁখ বেজে উঠল, তার সঙ্গে মিলিত উলুধ্বনি। ছোট পিসিমা গাড়িতে উঠে এলেন, হাতে রুপোর ছোট বাটিতে মধু। আঙুলে মধু ঠেকিয়ে উনি আমার কানে ছুঁইয়ে দিলেন। এ হল প্রতীক, শ্বশুরগৃহে যে যা বলবে তা মধুর শোনাবে। তারপর ছোট পিসিমা আমার ঠোঁটেও মধু ছুঁইয়ে দিলেন। নববধূ যা বলবে তা যেন শ্বশুরগৃহে মধুবৎ মনে হয়। আমার লেখা 'এক নম্বর বাড়ি' বইটি ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ঘটনাচক্রে এই বইয়ের বেশ কিছু অংশ এক গ্রীষ্মের অবকাশে অনিতার আউগসবার্গের বাড়িতে লেখা হয়েছিল। অনিতার বাড়ির পিছন দিকে খোলা বারান্দায় বসে আমি লিখতাম। আন্টি চেয়ার টেনে পাশে বসে থাকতেন আর বেশ খানিকটা লেখা হয়ে গেলেই আমাকে অনুবাদ করে শোনাতে বলতেন। সেই সময়ে এই বধূবরণের বর্ণনা শুনে আন্টি এমিলিয়ে যারপরনাই কৌতুক বোধ করেছিলেন। তারপর উনি মন্তব্য করলেন— 'Thank God, I did not have to go there.' ভাগ্যিস আমাকে আর ওখানে যেতে হয়নি।

আমার মনে হল উনি বলতে চাইছেন যে, এইসব বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ওকে যে যেতে হয়নি তাতে উনি রক্ষা পেয়েছেন। আমার জীবনের উডবার্ন পার্কের দিনের কথা আমি আমার 'An Outsider in Politics' বইতেও পরে লিখেছি। আমার মনে হয় ভারতীয় আচার-ব্যবহারের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ব্যাপারে অনিতা ও আন্টি এমিলিয়ের দৃষ্টিভঙ্গির একটা পার্থক্য আছে।

অনিতা যখন প্রথমবার ১৯৬০-১৯৬১ সালে ভারতে এল তখন সে এমনভাবে ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালি জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিল তা চমকপ্রদ। সে এমনভাবে ভাত-ডাল হাত দিয়ে মেখে খেতে পারত, এমন সহজ ভঙ্গিতে শাড়ি পরে ঘুরত, এমনভাবে গুরুজনদের

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত, মনে হত এসব তার সহজাত, কিছু শেখাতে হয়নি। অন্যদিকে আন্টি এমিলিয়ের ভারতীয় রীতি-নীতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ছিল। ভারতীয় রাজনীতি, ভারতীয় ইতিহাস, বিশেষ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে ওঁর সম্যক জ্ঞান ছিল। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সুদীর্ঘ সম্পর্কের ফলে এসব উনি জানতেন। কিন্তু একটি বিদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনে তিনি কতখানি খাপ খাইয়ে চলতে পারবেন সে বিষয়ে তাঁর যেন সংশয় ছিল। নিয়তি এমনভাবে তাঁর জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছিল যে, সেই পরীক্ষার ভিতর দিয়ে তাঁকে আর যেতে হয়নি। অনিতা নিজের পিতার দেশ ভালভাবে ঘুরে দেখে নিয়ে ভিয়েনাতে ফিরে গেল। তার মা সেখানে সাগ্রহে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

আউগসবার্গে ১৯৯৩ সালের গ্রীষ্মের অবকাশ কাটিয়ে দেশে ফিরে আসা মাত্রই শিশির ও সুগত এতকাল অন্তরালে থাকা আন্টির সেই পত্রাবলি প্রকাশের কাজ শুরু করে দিলেন। কিছুকাল হল নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো খণ্ডে খণ্ডে সুভাষচন্দ্রের রচনাবলি প্রকাশ করছিলেন। ষষ্ঠ খণ্ড অবধি প্রকাশিত হয়েছে। তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ইংরেজি সমগ্র রচনাবলির সপ্তম খণ্ডটি হবে Letters to Emilie Schenkl, 1934-1942। বাংলা ও হিন্দি রচনাবলিও সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়ে চলেছিল। বাংলাতে এমিলিয়ে পত্রাবলি ষষ্ঠ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সুভাষচন্দ্র ১৯৩৪-১৯৪২ এই আট বছরে এমিলিয়েকে ১৬২ খানা চিঠি লিখেছেন। রোম থেকে লেখা প্রথম চিঠিতে উনি জানিয়েছিলেন— 'চিঠিপত্র লেখায় আমি বেশ অনিয়মিত তবে মানুষ হিসেবে আশা করি আমি খুব খারাপ নই।' চিঠিপত্র লেখায় নিয়মিত নই ঘোষণা করার পর কিন্তু দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর সব কাজের মধ্যেও এমিলিয়েকে নিয়ম করে

চিঠি লিখে চলেছেন। কংগ্রেসের সভাপতির কাজে ১৯৩৮-১৯৩৯ সালে যখন সদা ব্যস্ত তখনও চিঠি লেখায় ছেদ পড়ছে না। কতরকম বিচিত্র জায়গা থেকে চিঠি লিখছেন, হয়তো জেলখানা থেকে, তা না হলে গৃহবন্দি অবস্থাতে। বেশির ভাগ চিঠির ওপরেই 'সেনসর্ড অ্যান্ড পাসড' ছাপ মারা। সুভাষচন্দ্র এমিলিয়েকে সাবধান করে দিচ্ছেন যে, যদি উনি জেলের বাইরে মুক্ত অবস্থাতেও থাকেন তবু কিন্তু ওঁর প্রতিটি চিঠি পুলিশ খুলে পড়বে। সুভাষ বা এমিলিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত কথাবার্তা, কোনও আবেগের কথা চিঠিপত্রে খোলাখুলি লিখতে পারতেন না। কোনও অনুরাগের অভিব্যক্তি হয়তো সঙ্গোপনে নানা কথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া গেল তাও আবার জার্মান ভাষায়।

ইউরোপ ছেড়ে পূর্ব এশিয়ার পথে ১৯৪৩-এর গোড়ায় উনি সাবমেরিনে পাড়ি দিলেন। এমিলিয়েকে চিঠি লেখায় ছেদ পড়েনি। আন্টি বলেছিলেন যুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পর ভিয়েনা দখল করে নেয় মিত্রশক্তি অর্থাৎ ইংরেজ আমেরিকান রাশিয়ান। ইংরেজ সেনা এমিলিয়ের অ্যাপার্টমেন্ট তল্লাশি করে ডেস্ক থেকে একগুচ্ছ চিঠি নিয়ে চলে যায়। এই চিঠিগুলি ছিল ইউরোপ ছেড়ে যাওয়ার পর রেডিয়ো কমিউনিকেশনের মাধ্যমে পাঠানো। আমাদের ভাগ্য ভাল আসল চিঠিগুলির খোঁজ তারা পায়নি। ইংরেজ সেনা তল্লাশি চালাবার সময়ে বলেছিল, এসব চিঠিপত্র তারা পরে ফেরত দিয়ে যাবে। বহুকাল বাদে নব্বইয়ের দশকে ব্রিটিশ আর্কাইভস-এ খোঁজখবর করলে তারা জানিয়েছিল, এসব ঠিক যুদ্ধের পর বাজেয়াপ্ত হওয়া কাগজপত্রের হদিশ তাদের জানা নেই।

সুভাষচন্দ্র এমিলিয়েকে যত চিঠি লিখেছিলেন সে সব তো এমিলিয়ে যখের ধনের মতো রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু চিঠিপত্র পড়ে বেশ বোঝা যাচ্ছে

এমিলিয়ে নিজেও সুভাষচন্দ্রকে নিয়মিত এবং ঘনঘন চিঠি লিখতেন। কিন্তু সে সব চিঠি গেল কোথায়? সুভাষচন্দ্রের জীবন ঝড়ের মতো, কখনও কারাগারে, কখনও বিদেশে নির্বাসনে, কখনও কারামুক্ত থাকলেও দেশের সেবায় ব্যস্ত রয়েছেন। সযত্নে চিঠিপত্র গুছিয়ে রাখা হয়তো সম্ভব ছিল না। কিন্তু শিশিরকুমার বসু ও সুগত যখন এমিলিয়ের চিঠির ভল্যুম সম্পাদনার কাজে ব্যস্ত সেই সময়ে খুব আশ্চর্যভাবে সুভাষচন্দ্রকে লেখা এমিলিয়ের আঠারোখানা চিঠি আবিষ্কৃত হল। ব্যাপারটা বেশ কৌতূহলজনক। একদিন শিশিরকুমার তাঁর চেম্বারে বসে রোজ যেমন দেখেন তেমনি শিশু রোগীদের দেখছেন, এমন সময় এক বাঙালি ভদ্রলোক ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। কাজের ফাঁকেই উনি ভদ্রলোককে ডেকে পাঠালেন। দেখা হতে ভদ্রলোক বললেন, 'আমি বিদেশে থাকি। সম্প্রতি আমার পিতৃবিয়োগ হওয়াতে দেশে এসেছিলাম। আমি বাবার সব জিনিসপত্র বিলিব্যবস্থা করতে গিয়ে এই জিনিসটা পাই—', তার হাতে ছোট একটি বাক্স।

'এই বাক্সের ভিতর কিছু কাগজপত্র রয়েছে। আমার মনে হয় নেতাজি সংক্রান্ত কিছু কাগজ। এইসব রাখার কাজে আপনার চেয়ে যোগ্য আর কাকে পাব, তাই আমি আপনার কাছেই এটি রেখে গেলাম।' টেবিলের উপর বাক্সটি রেখে তিনি চলে গেলেন।

শিশিরকুমার বসু বিস্মিত হয়ে দেখলেন একটি সিগার বক্স। আর এই সিগারের বাক্স তাঁর খুবই চেনা। এই রকম সিগারের বাক্স ব্যবহার করতেন ওঁর বাবা শরৎচন্দ্র বসু। শরৎচন্দ্র বসুর সিগার বক্স থেকে পাওয়া গেল সুভাষচন্দ্রকে লেখা এমিলিয়ের আঠারোখানা চিঠি। আরও দু'-একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি বহুদিন আগে মেজদাদা শরৎচন্দ্রকেই লেখা। একটি তো

আই.সি.এস থেকে পদত্যাগ করার সময়ে মেজদাদাকে লেখা বিখ্যাত চিঠি।

এইসব এক অজানা ব্যক্তির হাতে গেল কীভাবে সেটা রহস্যই রয়ে গেল। সুভাষচন্দ্র কি কোনও বিশ্বাসী বন্ধুকে এসব রাখতে দিয়েছিলেন! নাকি পুলিশ কখনও সার্চ করতে এসে এসব নিয়ে যায়, তিনি কি পুলিশের লোক ছিলেন? সে যাই হোক, শিশির ও সুগত স্থির করলেন সুভাষ রচনাসমগ্রের সপ্তম খণ্ডে এমিলিয়ের পত্রাবলি নামে যা প্রকাশ হতে চলেছে তাতে এই চিঠিগুলি অবশ্যই যুক্ত হবে। আমাদের সকলেরই খুব আনন্দ হল ভেবে যে, এই পত্রাবলিতে অন্তত অল্প হলেও এমিলিয়ের দিক থেকে লেখা কিছু চিঠিপত্র থাকবে।

যখন এমিলিয়ের চিঠিপত্র বইটি একেবারে প্রকাশ হওয়ার মুখে তখন একদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক অভীক সরকার আমাকে ফোন করলেন। উনি বললেন, সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে একটু নতুন দৃষ্টিপাত করবে এই বই। ওঁদের খুব ইচ্ছা প্রকাশিতব্য বইটির উপর আমি যদি অগ্রিম একটি আলোচনা লিখে দিই ওঁরা তা প্রকাশ করবেন। আমি রাজি হয়ে গেলাম। আমি খুব মন দিয়ে সব চিঠি পড়লাম আর ঠিক করলাম, আমি নিজের কোনও মতামত চাপিয়ে দেব না, কোনও অ্যানালিসিস বা বিশ্লেষণ করতেও যাব না। আমি যেমনভাবে নিজে চিঠিগুলো পড়লাম তেমনভাবেই পাঠকদের চিঠির মধ্য দিয়ে একটা জার্নিতে নিয়ে যাব। তাঁরা নিজেরাই উপলব্ধি করবেন, কেমন করে কাহিনির দুটি চরিত্র আলাপ হবার পর অল্প সময়ের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লেন। কেমন করে সেই বন্ধুত্ব গভীরতর সম্পর্কের মধ্যে চলে গেল। দু'জনের চারপাশের আবহাওয়া তখন এমন যে, মন খুলে চিঠিপত্র লিখবেন একে অপরকে

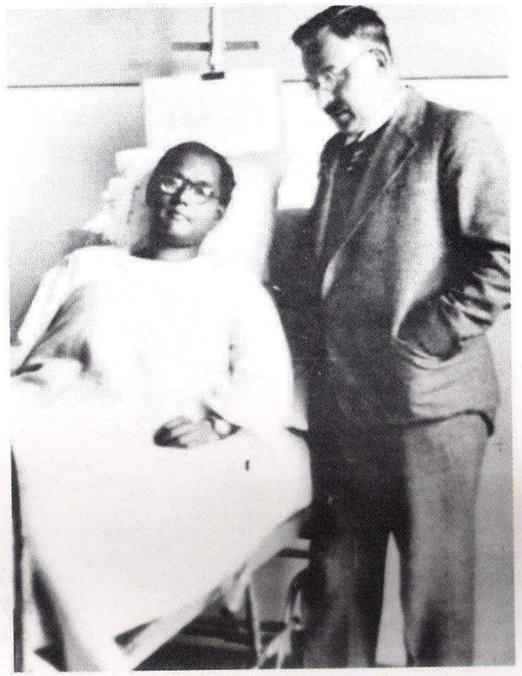

ভিয়েনায় গলব্লাডার অস্ত্রোপচারের পরে প্রফেসার ডেমেল-এর সঙ্গে সুভাষ, ১৯৩৫।

গলব্লাডার অস্ত্রোপচারের পরে সুভাষ আরোগ্যলাভের সময়।

এমিলিয়ে ও সুভাষ বাদগাস্টাইনে, ডিসেম্বর ১৯৩৭।

বাঁদিক থেকে: এ সি এন নাম্বিয়ার, হেডি ফুলপ-মিলার, সুভাষ, এমিলিয়ে এবং অমিয়নাথ বসু, সঙ্গে অ্যালসেশিয়ান কুকুর রুফ, বাদগাস্টাইনে, ডিসেম্বর ১৯৩৭।

বাঁদিক থেকে: এ সি এন নাম্বিয়ার, ডেডি ফুলপ-মিলার, সুভাষ, অমিয়নাথ বসু এবং এমিলিয়ে, বাদগাস্টাইন, ডিসেম্বর ১৯৩৭।

সুভাষ ও এমিলিয়ে, মাঝখানে এ সি এন নাম্বিয়ার, ডিসেম্বর ১৯৩৭।

এমিলিয়ে ও সুভাষ বাদগাস্টাইনে, মার্চ ১৯৩৬।

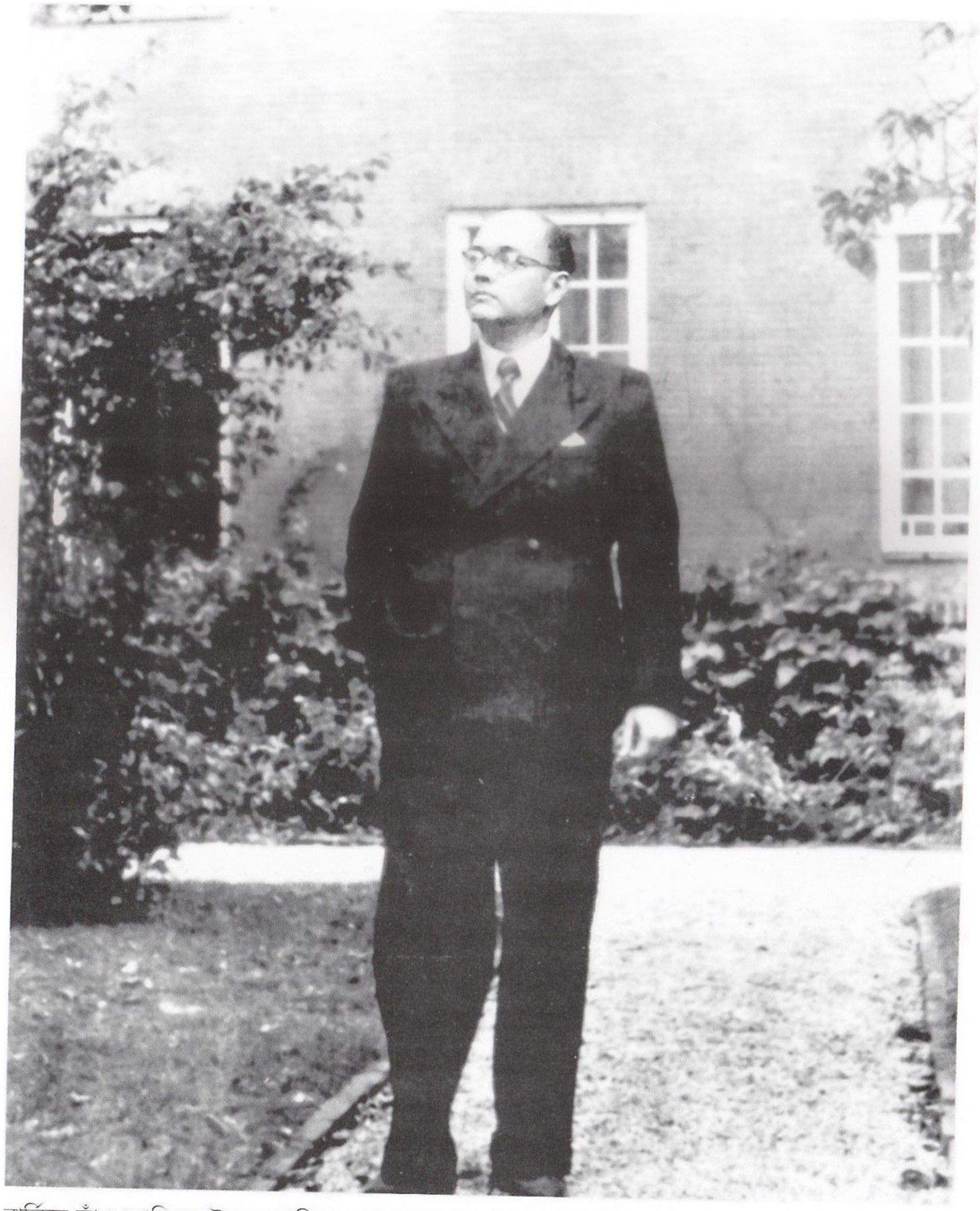

বার্লিনে তাঁর সোফিয়েনস্ট্রাসের বাড়ির বাগানে সুভাষচন্দ্র বসু, ১৯৪২।

অনিতা সবে হাঁটতে শিখেছে।

বাল্যে অনিতা।

এমিলিয়ে শেঙ্কল।

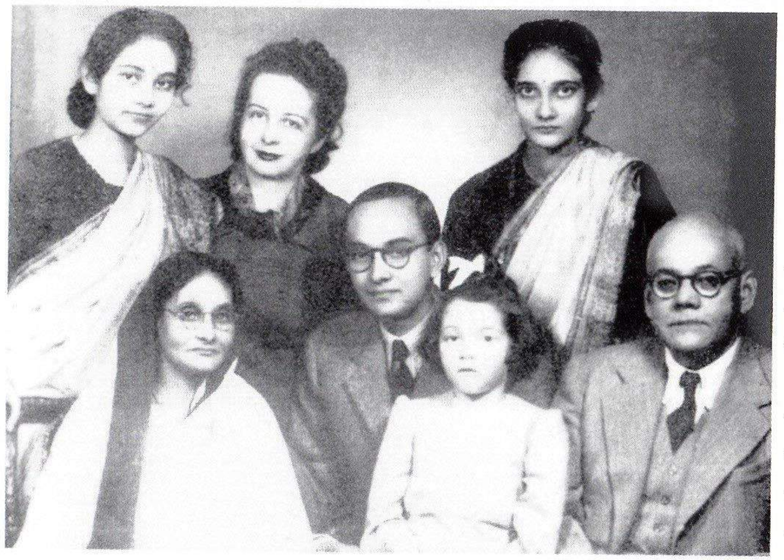

অনিতার ছ'বছরের জন্মদিনে। বাঁদিক থেকে বসে: বিভাবতী বসু, অনিতাকে কোলে নিয়ে শিশির এবং শরৎ বসু। বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে: রমা, এমিলিয়ে ও চিত্রা। ভিয়েনা, ২৯ নভেম্বর ১৯৪৮।

এমিলিয়ে শেংকল ও বিভাবতী বসু ভিয়েনায়, নভেম্বর ১৯৪৮।

তারও কোনও উপায় নেই। সুভাষচন্দ্র চিঠি শুরু করেন শুকনো ভাবে 'ডিয়ার মিস শেংকল' বলে, তার শেষে জার্মান ভাষায় হয়তো বললেন 'অভিডেজেন'— বিদায়। শেষ হল 'ইয়োর্স সিনসিয়ারলি সুভাষ, সি বসু।'

১৯৩৬ সালে লেখা একটি চিঠিতে বললেন, 'আমি তোমাকে অনেক বিষয়ে অনেক কথা লিখতে চাই।...আমি একটু ছাড়া ছাড়া ভাবে লিখব তুমি মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা পড়ে নিয়ো।'

দু'জনের মধ্যে যে আত্মিক বন্ধন ছিল আর দূরে থাকলে দু'জনে দু'জনের বিরহে কত কাতর হতেন, তা এইসব চিঠির ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে।

এইসব চিঠিপত্রের মধ্যে কী আছে আমরা যখন কিছুই জানতাম না, সেই সময়ে ১৯৭১ সালের শরৎকালে আমি আর শিশির ভিয়েনাতে আন্টি এমিলিয়ের সঙ্গে ছুটি কাটাতে যাই। ভিয়েনার সেই কয়েকটা দিন নানা কারণে আমার মনের মধ্যে গেঁথে আছে। সে বছর আমরা চেকোশ্লোভাকিয়ার ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট-এর নিমন্ত্রণে প্রাগ-এ একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে যাচ্ছিলাম। প্রাগের কনফারেন্স-এর পর বার্লিনে আলেকজান্ডার ওয়ার্থ আর একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। আমাদের তখনকার পূর্ব বার্লিনেও যাবার কথা। সেখানে অধ্যাপক ভাইডেমান নেতাজিকে নিয়ে কাজ করছেন। এইসব সফরের আগে কয়েকটা দিন আন্টি এমিলিয়ের সঙ্গে ভিয়েনাতে কাটাব। আমার অবশ্য আরও একটা কাজ আছে। প্রাগের কনফারেন্সেও আমার একটি পেপার পড়বার কথা। বিষয় "ইমপর্ট্যান্ট উইমেন ইন নেতাজি'স লাইফ", নেতাজির জীবনে যে সব নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তাদের কথা।

আমি চারজনকে বেছে নিয়েছি। তাঁর মধ্যে তিনজনের কথা আমি দেশ ছাড়বার আগেই লিখে ফেলেছি তারা হলেন— মা জননী প্রভাবতী, দেশবন্ধু পত্নী বাসন্তীদেবী ও মেজোবউদিদি বিভাবতী।

আমি আন্টিকে বললাম, আমি চতুর্থ যে ইমপর্ট্যান্ট মহিলার কথা লিখব তিনি এমিলিয়ে শেংকল। এই লেখা আমি ভিয়েনাতে বসে লিখব, তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে আমি কথা বলতে চাই। আন্টির কাছ থেকে ঝটিতি জবার এল, আমি ওঁর জীবনে মোটেই কোনও ইমপর্ট্যান্ট ওম্যান নই। আমি মনে ভাবলাম একি কোনও অভিমানের কথা। তবে নীরব রইলাম।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি আর আন্টি বাস্টিয়ানগাসের বাড়ির বসবার ঘরে বসে ছিলাম। আন্টির চোখে একটা উদাস দৃষ্টি। উনি নিজে থেকেই সকালবেলার কথোপকথনের রেশ টেনে বললেন, 'একটা কথা শোনো কৃষ্ণা, তোমাদের আংকল আমাকে বলেছিলেন, আমার প্রথম প্রেম এবং একমাত্র প্রেম আমার দেশ। তোমাকে দেবার মতো আমার আর কিছু অবশিষ্ট নেই।'

একটু চুপ করে থেকে আন্টি এমিলিয়ে যোগ করলেন— 'উনি বলেছিলেন, অবশ্য একথা জেনেও তুমি আমাকে গ্রহণ করো—' বাক্যটি আর আন্টি শেষ করেননি।

এদিকে আমি অবশ্য মুশকিলে পড়লাম। আমার পেপার সম্পর্কে তো আন্টি বিশেষ সহযোগিতা করবেন না। আমি ঠিক করলাম আমি নিজে যতটুকু জানি, তার সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সূত্রে শিশিরের কাছে, তার বোনেদের কাছে এমিলিয়ে-সুভাষ সম্পর্কে যা শুনেছি তা যুক্ত করে নেব। বসুবাড়িতে যে কাহিনি সকলের মুখে শুনেছি তা এইরকম। সুভাষচন্দ্র ও এমিলিয়ে ১৯৩৪ সাল থেকে পরস্পরকে চিনতেন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

তবে তাঁরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন পরে। যখন নেতাজি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলার সময়ে বার্লিনে উপস্থিত হন ও এমিলিয়েকে ভিয়েনা থেকে ডেকে পাঠান তখন তাঁরা বিবাহ করেন। সুভাষচন্দ্র বার্লিনে পৌঁছলেন ১৯৪১ সালের ২ এপ্রিল। আর তিন তারিখে এমিলিয়েকে ভিয়েনাতে লিখলেন—

'তুমি আমার কাছ থেকে এই চিঠি পেয়ে আশ্চর্য হয়ে যাবে। আরও অবাক হবে জেনে যে আমি এই চিঠি বার্লিন থেকে লিখছি।'

আরও লিখলেন, 'আমি জানি না আমি ভিয়েনাতে যেতে পারব কি না। অতএব তোমাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বার্লিনে আসতে হবে। তুমি আসতে পারবে তো? তুমি তো জানো তোমাকে পেলে আমার কত আনন্দ হবে।' উনি এমিলিয়েকে জানিয়ে দিলেন যে ওঁর পাসপোর্ট ওঁর নিজের নামে নয়। উনি অরল্যান্ডো মাৎসোটা এই ইটালিয়ান নামে এখানে পরিচিত।

সুভাষচন্দ্র বসু, ছদ্মনাম 'অরল্যান্ডো মাৎসোটা'র কাছ থেকে এমিলিয়ে এই চিঠি যখন পেলেন, প্রায় একই সময়ে জার্মান ফরেন অফিস থেকেও বার্তা পেলেন। তারা জানাল— বোস এখন বার্লিনে। সম্ভব হলে আপনাকে যথাসম্ভব শীঘ্র এখানে চলে আসতে বলছেন। আসতে পারবেন কি না জানান।

এমিলিয়ে এলেন এবং সেই সময় থেকে তাঁরা বার্লিনে সোফিয়েনস্ট্রাসের বাড়িতে একসঙ্গে বসবাস করতে লাগলেন। পারিবারিক সূত্রে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে যে কাহিনি আমি শুনেছিলাম তা হল, এই সময়ে সুভাষচন্দ্র ও এমিলিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এমনকী ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ সময়কালও প্রচলিত ধারণা ছিল। এ কথাও

শুনেছিলাম হিন্দুমতে বিবাহ হয়েছিল। 'আজাদ হিন্দ' নামে যে জার্নাল বার্লিনে প্রকাশ হত তার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন জনৈক মি. ভাট (Bhatt), ব্রাহ্মণ হবার সুবাদে তিনি পৌরোহিত্য করেছিলেন।

এইসব পারিবারিক কাহিনি আমি আমার ইমপর্ট্যান্ট উইমেন ইন নেতাজি'স লাইফ-এর এমিলিয়ে শেংকল অধ্যায়ে যুক্ত করলাম। প্রাগ শহরে ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটে মিলোসাভ ক্রাসা ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক স্কলারের উপস্থিতিতে আমি যখন পেপারটি পড়লাম তখন বেশ ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হল।

প্রশ্নোত্তরের সময়ে অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে সব নারী নেতাজির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন তাঁরা সকলেই মাতৃসমা কেন! প্রভাবতী তাঁর নিজের মা, দেশবন্ধুপত্নী বাসন্তীদেবীকেও উনি 'মা' ডাকতেন, আর মেজোবউদিদি বিভাবতীকেও তিনি মায়ের আসনে বসিয়েছিলেন। এঁদের প্রশ্ন শুনে আমার বেশ কৌতুক বোধ হয়েছিল। একজন ডেনমার্কের মহিলা ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসা করলেন, সুভাষচন্দ্র বোসের কি কোনও 'মাদার ফিকসেশন' (Mother fixation) ছিল? পত্নী এমিলিয়ে কি একরকম সারোগেট মাদার ছিলেন?

আমার এঁদের বুঝিয়ে বলতে হল ভারতীয় ঐতিহ্যে মাতৃভাবনার এক বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। আমরা ঈশ্বরকেও মাতৃরূপে আরাধনা করি আবার দেশও আমাদের কাছে মা।

আমার এই লেখাটি পরে 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি'তে প্রকাশিত হল। তখন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন খুশবন্ত সিং। আমি এই লেখার ক্লিপিং ভিয়েনাতে আন্টি এমিলিয়েকে পাঠিয়ে দিলাম। আন্টি আমাকে জানালেন লেখাটি তাঁর ভাল লেগেছে। এমিলিয়ে সম্পর্কে আমি যা লিখেছি তাতে

কোনও ভুল আছে এমন কথাও তিনি কিছু বললেন না। পরবর্তীকালে অনেক স্কলার আমার লেখাটি প্রামাণ্য বলে গণ্য করেছেন। ফলে, বিবাহের সময়কাল ইত্যাদি ওঁরা আমার লেখা থেকে গ্রহণ করেছেন। প্রাগের এই আন্তর্জাতিক কনফারেন্স হয়েছিল ১৯৭১ সালে। আজও মনে পড়ে পেপার পড়তে যখন আমাকে নাম ধরে ডাকা ডাকা হল শুনতে পেলাম, 'এখন পড়বেন কৃষ্ণা বোসোভা।' বোসোভা নামটি আমার বেশ ভাল লাগল, একটা সুন্দর শব্দধ্বনি আছে।

আমেরিকান ঐতিহাসিক অধ্যাপক লেনার্ড গর্ডন আশির দশকে দশবছরের বেশি সময় ধরে নেতাজির ওপর গবেষণা করছিলেন। তিনি ভারত ও ভারতের বাইরে নেতাজির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত এমন প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এমিলিয়েরও সাক্ষাৎকার নিতে ভিয়েনা যান।

অধ্যাপক গর্ডন খুব উত্তেজিত হয়ে শিশিরকে ও আমাকে জানালেন যে, আন্টি গর্ডনকে বলেছেন সুভাষ ও তাঁর বিবাহের তারিখ ২৬ ডিসেম্বর ১৯৩৭। আমরা সকলেই পারিবারিক ভাবে এই খবরে বিস্মিত হলাম। আগে একথা পরিবারের কেউ শুনিনি। জানা গেল গর্ডন ছাড়াও দ্বিতীয় আর এক ঐতিহাসিক অধ্যাপক বি আর নন্দকে, নেহরু মিউজিয়ামে অর‍্যাল রেকর্ডিং করার সময় এমিলিয়ে এই একই তারিখ বলেছেন। তৃতীয় ঐতিহাসিক সুগত বসুকেও এমিলিয়ে তাঁর বিবাহের তারিখ ২৬ ডিসেম্বর বলেই জানান। সুগত যখন শিশিরকুমার বসুর সঙ্গে এমিলিয়ের পত্রাবলি সম্পাদনার কাজ করছিল তখন সে এই তারিখ বিষয়ে এমিলিয়েকে প্রশ্ন করেছিল। তিনি বলেন ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৭, স্থান বাদগাস্টাইন। এ কথাও বলেন যে, তাঁরা দু'জনই স্থির করলেন বিবাহের কথা তিনি ও সুভাষ

একান্ত গোপন রাখবেন। সুগত জিজ্ঞাসা করেছিল এই গোপনীয়তার কারণ কী। এমিলিয়ে বলেন, সুভাষের জীবনে তাঁর দেশের কাজই ছিল অগ্রগণ্য। 'আমরা চাইনি তার মধ্যে কোনও অযথা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হোক।' 'We did not want an unnecessary upheaval' ('His Majesty's Opponent', Sugata Bose, p. 130)

আমি অনেকবার আমার স্বামী শিশিরকুমার বসুকে এবং আমার ননদদের, বিশেষ করে গীতাকে যাকে আমরা ন'দি বলে ডাকি— জিজ্ঞাসা করেছি, আচ্ছা, যুদ্ধের পর আন্টি যে বাবাকে (শরৎচন্দ্র বসু) চিঠি লিখে বিবাহের কথা জানালেন সেটি গেল কোথায়? সকলেই ভাসা-ভাসা ভাবে জবাব দিয়েছিল, বাবার কাগজপত্রের সঙ্গে আছে কোথাও। ২০১৫ সালে সেই চিঠি প্রথম প্রকাশ্যে আসে। আমরা জানতে পারি শরৎচন্দ্র বসুর অন্যতম পুত্র অমিয়নাথ চিঠিটি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। জীবনীকার অধ্যাপক লেনার্ড গর্ডন বই লেখার সময়ে তাঁর সহযোগিতা চেয়েও পাননি। এতকাল বাদে চিঠিটি প্রকাশ্যে এল। চিঠিটি দেখে আমি খুবই পরিতৃপ্ত বোধ করি। কারণ আমি প্রাগে প্রদত্ত আমার গবেষণাপত্রে ও পরে 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি' পত্রিকায় খুশবন্ত সিং যা ছেপেছিলেন, সেই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আমি উডবার্ন পার্কের বাড়িতে পারিবারিক ভাবে শোনা কাহিনির ওপর ভিত্তি করে যা লিখেছিলাম সেই পারিবারিক কাহিনির মূল ভিত্তি হল আন্টির লেখা এই চিঠি।

তিনি স্পষ্ট জানাচ্ছেন, বার্লিনে তাঁদের বিবাহ হয় এবং তা হয় হিন্দু মতে। সে সময়ে হিটলারের জমানায় দুই ধর্মের বা দুই জাতির মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল।

বাদগাস্টাইন ও বার্লিন এই দুটি জায়গায়, দুটি ভিন্ন সময়ে ১৯৩৭ ও

যুদ্ধের মধ্যে নেতাজি এসে পৌঁছবার পর বিবাহের কথা এমিলিয়ে নিজে বলে গেছেন দেখতে পাচ্ছি। কেন এই দুটি আলাদা শহর ও ভিন্ন সময়ের কথা তিনি বলছেন তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করার সুযোগ হয়নি, তখন আমাদের অনুমান নির্ভর হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

বাদগাস্টাইন অস্ট্রিয়ার পাহাড়ের কোলে এক অপূর্ব সুন্দর শৈলশহর। নেতাজির প্রিয় শহর। স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে এসে থাকতে ভালবাসতেন। চারিদিকে বরফে ঢাকা পর্বতচূড়ার দিকে তাকিয়ে আপনা থেকেই বলতে ইচ্ছা হয় 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।'

১৯৩৭ সালের শীতকালে মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য নেতাজি এসেছেন বাদগাস্টাইন। আগেই চিঠি লিখে ডেকে পাঠিয়েছেন এমিলিয়েকে। এমন কথাও লিখেছেন, তোমার মা-বাবাকে ছাড়া বেশি কাউকে জানিও না। সেই শীতকালেই ফোটোগ্রাফার, ফিলম-মেকার চেট্টিয়ার এসেছেন সেখানে। তাই তো কত ছবি পেয়ে গেলাম আমরা।

এমনকী অনুমান করা যায় যে, ২৬ ডিসেম্বর, বিশেষ দিন, এমিলিয়ের জন্মদিনও সেদিন— সুভাষ ও এমিলিয়ে পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন আজ থেকে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। তারপর ক'টাই বা দিন একসঙ্গে কাটাতে পারলেন? নেতাজি ফিরে গেলেন ভারতে। ১৯৩৮ জানুয়ারি, তিনি কংগ্রেসের ভাবী রাষ্ট্রপতি। দেশের কাজ থেকে মন বিক্ষিপ্ত হয় এমন কিছু কেন চান না তাও বুঝতে পারা যায়। এমিলিয়ে সর্বদা আত্মত্যাগ করেছেন, সুভাষ যেন তাঁর প্রথম প্রেম স্বদেশের কাজে লিপ্ত থাকতে পারেন।

যুদ্ধের মধ্যে সুভাষ বার্লিন এসে পৌঁছলেন, এমিলিয়েকে ডেকে পাঠালেন। সোফিয়েনস্ট্রাসের বাড়িতে তাঁরা প্রকাশ্যে একসঙ্গে রয়েছেন। এই সময়ে হয়তো আনুষ্ঠানিক বিবাহ প্রয়োজন মনে হয়েছিল। জার্মান

আইন মতে কিছু সম্ভব নয়। অতএব হিন্দুমতে বিবাহ। স্বল্পস্থায়ী গৃহী জীবন। অনিতার জন্ম হল ২৯ নভেম্বর ১৯৪২। স্ত্রী ও শিশুকন্যাকে ছেড়ে চলে যেতে হল ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩।

একেই বলে অনাসক্ত, অনুরাগী, সংসারী, সংসারত্যাগী। শাস্ত্রে এমন জনকেই সাধক বলা হয়।

এমিলিয়ে পত্রাবলি (7th Volume: 'Collected Works') প্রকাশের জন্য তৈরি। 'আনন্দবাজার' সম্পাদক অভীক সরকার আমার কাছে প্রাক-প্রকাশ যে আলোচনা চেয়েছিলেন তা লিখে ফেলেছি। এবার পাঠিয়ে দিলাম। যে রবিবার প্রকাশ হবে তার আগের শুক্রবার পত্রিকাতে একটি ছোট বিজ্ঞাপন বার হল। আনন্দবাজারের তরুণ একজিকিউটিভ এডিটর অতি উৎসাহের সঙ্গে এমন ভাষায় বিজ্ঞাপনটি লেখেন যা অনেকে ভালভাবে নিলেন না। আমার নিজেরই মনে হল, আমার লেখার গাম্ভীর্য ও মর্যাদার সঙ্গে বিজ্ঞাপনটি খাপ খায় না। আমি জানতাম বিষয়টি স্পর্শকাতর, তাই অত্যন্ত সাবধানে, সশ্রদ্ধ ও মর্যাদাপূর্ণভাবে লিখেছিলাম।

রবিবার ভোরবেলা যখন কাগজ বাইরে এনে বিভিন্ন জায়গায় পাঠাবার জন্য গাড়িতে তোলা হচ্ছে, হঠাৎ একদল দুষ্কৃতী 'আনন্দবাজার' অফিসের সামনে উপস্থিত হয়ে খবর-কাগজে আগুন লাগাতে শুরু করল। আরে, আরে এতে কী আছে? কেন এমন করছ জিজ্ঞাসা করাতে তারা বললে, 'ক্যায়া মালুম ক্যায়া হ্যায়।' ফরওয়ার্ড ব্লক দলের খিদিরপুর অঞ্চলের এক ডাকাবুকো নেতার নাম করে বললে— 'উসনে বোলা জ্বালা দেও তো জ্বালা দিয়া।' এরা রটনা করে দেবার চেষ্টা করেছিল বিজ্ঞাপনের উপর ভরসা করে যে, লেখাতে অপমানজনক কিছু আছে।

'আনন্দবাজার'-এর এক সিনিয়র সাংবাদিক সাতসকালে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে ঘটনাটি জানান।

তিনি বিস্মিত হয়ে বলেন— 'কে লিখেছে? কৃষ্ণা? মানে শিশিরের বউ? সে কেন নেতাজি সম্পর্কে খারাপ কিছু লিখতে যাবে!

তাঁর হস্তক্ষেপে কি না জানি না ব্যাপারটি বন্ধ হয়। তবে ততক্ষণে হাজার পঞ্চাশ 'আনন্দবাজার' পোড়ানো হয়ে গেছে।

বেলার দিকে অভীক সরকার আমাকে ফোন করে বলেন— কুছ পরোয়া নেই। যত কাগজ পুড়েছে তত আবার ছাপা হচ্ছে। সোমবারের কাগজের সঙ্গে আবার বিলি হবে।

সুভাষ ও এমিলিয়ের প্রথম দেখা: জুন মাস, ১৯৩৪ সাল

ভারত থেকে বহুদূরে ইউরোপের ভিয়েনা শহরে নেতাজি নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন ১৯৩৪ সালে। উনি তাঁর বিখ্যাত বই 'ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' লিখতে শুরু করলেন। একজন সেক্রেটারি প্রয়োজন। ইংরেজি জানা হওয়া চাই আর টাইপ করতে পারা চাই। বন্ধু ডা. মাথুরকে জিজ্ঞাসা করলেন এমন কোনও চেনা-জানা কেউ আছে। মাথুর বললেন, হ্যাঁ, দু'জনকে জানি। দু'জনের মধ্যে কাগজপত্র দেখে যাকে ভাল মনে হল তাকে ইন্টারভিউর জন্য ডাকলেন নেতাজি। ইন্টারভিউ নেবার পর কেমন যেন খটকা লাগল। মনে হল দ্বিতীয় জনকেও একবার ডেকে দেখা যাক। দ্বিতীয় এলেন। নাম এমিলিয়ে শেংকল, ২৩ বছর বয়সি অস্ট্রিয়ান তরুণী। কাজটা তিনিই নিলেন।

আন্টি আমাকে বলেছেন, তাঁর বাবা একটুও খুশি হলেন না। কোথাকার কোন অজানা অচেনা ভারতীয়ের সঙ্গে কাজ করবে মেয়ে, খুবই অপছন্দ। ভারত দেশটা সম্পর্কেও কোনও ধারণা নেই, সাপ-বাঘ এইসবের দেশ! মেয়ে যখন ইন্টারভিউ দিচ্ছে তখনই তিনি সুভাষ বসুকে ফোন করে বসলেন। যখন শুনলেন মেয়ে বাড়ির পথে রওনা হয়েছে তখন নিশ্চিন্ত হলেন। আলাপ হবার পরে কিন্তু এই তরুণ ভারতীয় বিপ্লবীকে এমিলিয়ের মা-বাবার খুবই ভাল লেগেছিল। সুভাষচন্দ্রও স্ত্রীকে লেখা প্রতিটি

চিঠিতেই তাঁর মা-বাবা ও বোনকে প্রীতি সম্ভাষণ জানাচ্ছেন।

১৯৩৪ সালের জুন মাসে এমিলিয়ে সুভাষের সেক্রেটারির কাজ শুরু করলেন 'ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' বইটি লিখছেন সুভাষ। নভেম্বরে সুভাষ তাঁর নির্বাসিত জীবন থেকে অল্প সময়ের জন্য দেশে ফিরবার অনুমতি পেলেন। খবর এল তাঁর পিতৃদেব জানকীনাথ বসুর অবস্থা সংকটাপন্ন। সেকালে ইউরোপ থেকে ভারতে যেতে এমনকী এরোপ্লেনে গেলেও চার-পাঁচদিন লেগে যেত। এই যাত্রাপথে এমিলিয়েকে সুভাষ তাঁর প্রথম চিঠিটি লেখেন ৩০ নভেম্বর রোম থেকে। মাত্র কয়েকমাসের মধ্যেই জুন থেকে নভেম্বর, এমিলিয়ে ও সুভাষ বেশ গাঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছেন তা চিঠিপত্র থেকে বেশ বোঝা যায়। মাত্র কয়েকদিনের যাত্রাপথে যেখানেই প্লেন থামছে সুভাষ একখানা চিঠি পাঠাচ্ছেন— ভেনিস, এথেন্স, কায়রো, বাগদাদ, রোম, এমিলিয়েকে নানা খবর দিয়ে চিঠি লিখছেন। কলকাতা পৌঁছলেন ডিসেম্বর ৪ তারিখে। বড় দেরি হয়ে গেল। ডিসেম্বরের ২ তারিখে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়ে গিয়েছে। এলগিন রোডের বাড়িতে সুভাষ গৃহবন্দি হলেন। এমিলিয়েকে চিঠিতে বুঝিয়ে লিখছেন হোম ইনটার্নড বা গৃহবন্দি হওয়ার অর্থ কী। আমি নিজের বাড়িতেই বন্দি হয়ে আছি। স্বামীর মৃত্যুতে তাঁর মা প্রভাবতীর গভীর শোকের কথা এমিলিয়েকে জানালেন। লিখলেন একজন পাশ্চাত্যের মানুষের পক্ষে আমাদের মানসিকতা বুঝতে পারা কঠিন। একজন হিন্দু রমণীর জীবন এমন এক অবিচ্ছেদ্যভাবে স্বামীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে যে, পতির অবর্তমানে জীবনধারণ মনে হয় অসহনীয়।

১৯৩৪ সালের ৩১ জানুয়ারি সুভাষ এমিলিয়ে ও তাঁর বাবা-মাকে আগামী নতুন বছরের প্রীতি সম্ভাষণ কলকাতা থেকেই জানালেন। আরও

লিখলেন তাঁর গলব্লাডারের ব্যথাটা খুব বেড়েছে। হয়তো একমাস ধরে অশৌচ পালনের সময় খাওয়াদাওয়ার যে কড়াকড়ি হয়েছিল তাতেই ব্যথাটা বেড়েছে। সুভাষ বেশ বুঝতে পারছেন এবার অস্ত্রোপচার করা ছাড়া উপায় নেই। একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল এমিলিয়েও গলব্লাডারের ব্যথায় ভোগেন। তবে তিনি জানিয়েছেন তাঁর সার্জারির প্রয়োজন নেই। জেনে সুভাষ নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। সেকালে যে কোনও অস্ত্রোপচার, যত ছোটখাটোই হোক, বেশ ঝুঁকির ব্যাপার ছিল।

অশৌচ পর্ব শেষ হওয়ার পর ৮ জানুয়ারি ১৯৩৫ সুভাষচন্দ্র কলকাতা ছাড়লেন, ইউরোপে নির্বাসিত জীবনে ফিরতে হবে। তবে এবার সমুদ্রযাত্রা করলেন, বম্বে থেকে MV Victoria জাহাজ ছাড়ল। সুভাষ নেপলস-এ এসে নামলেন। কয়েকদিন একটু বেড়ালেন। পম্পেই শহরে গেলেন, এ ছাড়াও আরও একটা আগ্নেয়গিরি সেলফাটারা তখনও জীবন্ত, সেটা দেখলেন। কাপ্রি যাবেন ঠিক করেছিলেন। হঠাৎ তুষারপাত হচ্ছে খবর পেয়ে যাত্রা বাতিল করলেন। এতসব খুঁটিনাটি খবর এমিলিয়েকে লেখা চিঠিপত্র থেকেই আমরা পাচ্ছি। একটা চিঠিতে বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর পাওয়া গেল। ২৫ জানুয়ারি ১৯৩৫ লিখছেন, 'আজ সন্ধ্যায় আমার মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎকার আছে।' এই সময়ে সুভাষ ৩ দিন রোমে ছিলেন। লিখছেন, 'আমার বইটি মুসোলিনিকে উপহার দেব।' 'ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' লন্ডন থেকে সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। এমিলিয়েকে জানালেন 'বই-এর ভূমিকাতে আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিয়েছি।' ২৩ জানুয়ারি ছিল জন্মদিন। এমিলিয়েকে লিখলেন— 'তুমি জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছ, ধন্যবাদ।' মজা করে বলছেন, 'আমি অবশ্য কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি মানুষটা অদ্ভুত, তাই না?'

মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাতের খবরটা অবশ্য সুভাষ এমিলিয়েকে গোপন রাখতে বলছেন।

নিজের জন্মদিন ভুলে গেলে কী হবে অন্য অনেক কথা কিন্তু ওঁর বেশ মনে থাকে। এমিলিয়েকে লিখলেন, তুমি কি ভাবো আমি তোমার টেলিফোন নম্বর ভুলে গেছি? এমিলিয়ে ভারত থেকে ধূপ কাঠি চেয়েছিলেন উনি নিয়ে এসেছেন। ধূপ কাঠি ছাড়াও আর একটি উপহার এনেছেন, স্বামী বিবেকানন্দের লেখা বই— 'Thoughts on Vedanta.'

সুভাষচন্দ্র এমিলিয়েকে জানালেন তিনি ভিয়েনাতে পৌঁছবেন ২৯ জানুয়ারি, ১৯৩৫। এরপর এক বছরের মধ্যে দু'জনের কোনও পত্রালাপ নেই। এর কারণ এই সময়ে তাঁরা দু'জন বেশ কিছুদিন একসঙ্গে ভিয়েনাতে কার্লসবাদ বা কার্লোভিভারিতে, অথবা হফগাস্টাইন বা বাদগাস্টাইনে সময় কাটাতে পেরেছিলেন। ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে সুভাষ ভিয়েনার হাসপাতালে ভরতি হলেন। তাঁর গলব্লাডার অপারেশন হবে। ভিয়েনায় খুব বিখ্যাত সার্জেন প্রফেসার ডেমল অপারেশন করলেন। অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাবার আগে সুভাষকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কি কিছু শেষ ইচ্ছার কথা জানাবেন? উনি এক টুকরো কাগজে লিখলেন,— 'আমার দেশবাসীর জন্য রইল আমার ভালবাসা আর আমার যা কিছু দায়ভার রইল আমার মেজদাদার উপর।' মেজদাদা হলেন শরৎচন্দ্র বসু।

তখনকার দিনে গলব্লাডার অপারেশন বেশ যন্ত্রণাদায়ক ছিল। সুভাষের সেরে উঠতে অনেক সময় লেগেছিল। সিস্টার এলভিরা আর অন্য নার্সেরা ওঁর যত্ন নিতেন। আন্টি এমিলিয়ে রোজ ওঁকে দেখতে আসতেন। ঠিক অপারেশনের পরেই ডাক্তারদের এমিলিয়ের সাহায্য দরকার হয়েছিল। এনাসথেসিয়ার ডোজ একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ জ্ঞান

ফিরছিল না। এমিলিয়েকে ডাক্তাররা বললেন, ওঁর সঙ্গে কথা বলে যান, পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনলে হয়তো উনি সাড়া দেবেন।

এদিকে সেরে উঠতে এত দেরি হচ্ছে দেখে সুভাষচন্দ্র অস্থির হয়ে পড়ছিলেন। উনি ওঁর ব্যস্ত জীবনে ফিরে যেতে চাইছিলেন। ১৯৩৩ সালের ইউরোপে নির্বাসিত জীবনের গোড়া থেকেই উনি সারা ইউরোপ সফর করে বেড়াচ্ছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা প্রচার করছিলেন। উনি অনেকগুলি ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন যেমন, ইন্দো-চেক ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি আর অস্ট্রিয়া-ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন। অপারেশনের পরে দীর্ঘ বাধ্যতামূলক বিশ্রাম ভিয়েনাতে কার্লসবাদে, হফগাস্টাইনে উষ্ণ জলের স্পাতে বেশ কয়েকমাস চলেছিল। অনেকদিন পেটে একটা বেল্ট ব্যবহার করতে হত। কলকাতার নেতাজি ভবনের মিউজিয়ামে সেই পেটের বেল্ট সংরক্ষিত আছে। ১৯৩৬ সালের গোড়াতে উনি আবার পরাধীন ভারতের ভ্রাম্যমাণ দূত হিসেবে কাজ শুরু করতে পারলেন।

জানুয়ারি ১৯৩৬ সালে সুভাষচন্দ্র সারা ইউরোপ সফর করলেন। প্রাগ, বার্লিন, কোলোন, অ্যান্টওয়ার্প, প্যারিস সব জায়গা থেকে একদিন অন্তর এমিলিয়েকে চিঠি লিখতেন। দুটো কারণে তিনি আন্টির জন্য খুব দুশ্চিন্তা করতেন। একটা হল আন্টির দুর্বল স্বাস্থ্য, উনি কেবলই ঠান্ডা লাগা আর কাশিতে ভুগতেন। 'তোমার শরীর খারাপের কথা জেনে খুব দুঃখ পেলাম। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। নিজের আর একটু যত্ন নিতে পার-না কেন?' উনি রাগ করে লিখলেন। উনি এমিলিয়েকে নানারকম চিকিৎসার পরামর্শও দিচ্ছেন। অন্য দুশ্চিন্তা ছিল আর্থিক কারণে। ইউরোপে তখনও ১৯২৯-১৯৩৩-এর গ্রেট ডিপ্রেশন চলছে। এমিলিয়ের একটা চাকুরির দরকার।

সুভাষের সঙ্গে বই লেখার কাজ শেষ হয়ে গেছে। ওঁর একটা উপার্জনের পথ দরকার। সুভাষ মাঝে মাঝে তাঁকে অল্পস্বল্প আর্থিক সাহায্য পাঠান যাতে উনি ওঁর ফরাসি শেখা আর ওষুধটষুধ কেনা চালিয়ে যেতে পারেন। সুভাষ স্থির করলেন এমিলিয়ে সাংবাদিকের কাজ করবেন। উনি চিঠিপত্রের মাধ্যমে এমিলিয়েকে কীভাবে রাজনীতিক বিশ্লেষক এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে লেখা লিখতে হয় তা শেখাতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

সুভাষ চেয়েছিলেন যদি এমিলিয়ে কোনও ভারতীয় খবর কাগজ বা ম্যাগাজিনে ভিয়েনার প্রতিনিধির কাজ পান। সুভাষের কাছে শিক্ষা পেয়ে এমিলিয়ে 'হিন্দু' খবর-কাগজে আর 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকাতে কয়েকটি লেখা লিখেছিলেন। কিন্তু উনি এরকম রাজনীতিক লেখা লিখতে মোটেই স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। সুভাষ খুব অসহিষ্ণু হয়ে পড়তেন এবং সোজাসুজি বলে দিতেন, তোমার লেখাটা একদম ভাল হয়নি, লেখাটা ছাপার যোগ্য নয়।

সুভাষচন্দ্রের খুব ব্যস্ত কর্মসূচি। প্যারিস থেকে ২২-০২-৩৬ তারিখে লিখলেন—

আমার প্রোগ্রাম এইরকম—

১. ২৫ তারিখ মঙ্গলবার লসান যাব।

২. ২৬ তারিখে নেহরুর সঙ্গে লসানে।

৩. ২৭ তারিখে লসান থেকে ভিলেনোভ-এ রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

৪. ২৭ বা ২৮ তারিখে বাদগাস্টাইনে ক্যুর হাউস হকল্যান্ড রওনা হব।

১৯৩৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীমতী কমলা নেহরু সুইজারল্যান্ডে মারা গেলেন। কমলার মৃত্যুতে সুভাষ লসানে আটকে গেলেন।

কমলা নেহরুর মৃত্যু

জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষচন্দ্র বসুর সম্পর্ক নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। ইউরোপে কমলা নেহরুর মৃত্যু এই দুই নেতার সম্পর্কের উপর এক নূতন আলোকপাত করে। ভারতের রাজনৈতিক আকাশে ত্রিশের দশকে নেহরু ও সুভাষ দুই নক্ষত্রের একসঙ্গে উত্থান হচ্ছিল। অবশ্য নেহরু বয়সে সাত বছরের বড় ছিলেন। কিন্তু তরুণদের নেতা মনে করা হত। দু'জনেরই বিদেশনীতি, শিল্পায়ন এবং সমাজতন্ত্র বিষয়ে একইরকম উৎসাহ ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে জওহর আর সুভাষ এই দু'জনকে 'মর্ডানিস্ট' (Modernist) বলে মনে করতেন।

এই দু'জনের চরিত্র ছিল ভিন্নধর্মী। সুভাষচন্দ্র ছিলেন স্পষ্টভাষী এবং তাঁর ছিল সুস্পষ্ট, নিজস্ব মত। নেহরু ছিলেন হ্যামলেটের মতো To be or not to be চিন্তায় দ্বিধাগ্রস্ত। এই দু'জনের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল একেবারে ভিন্নভাবে। নেহরুর বয়স যখন ত্রিশের কোঠায় তখন তিনি অকস্মাৎ ভারতের কৃষকের দুঃখ দারিদ্র্য উপলব্ধি করলেন। গাঁধীজির প্রভাব তাঁর জীবনে এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন এনেছিল। অপরদিকে সুভাষচন্দ্র নিতান্ত বালক বয়সে উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর জীবনে একটা মিশন আছে। ইস্কুলের ছাত্র থাকার সময়ে সুভাষ তাঁর মা প্রভাবতীকে এবং তাঁর মেজদাদা শরৎচন্দ্রকে সুদীর্ঘ দার্শনিক চিঠিপত্র

ভিয়েনায় শিশির ও অনিতা, ১৯৫০।

এমিলিয়ে, অনিতা ও ওমামা (এমিলিয়ের মা), ১৯৪০।

এমিলিয়ে ও কৃষ্ণা, বালকৃষ্ণ এবং হেলা নার্মার সঙ্গে ভিয়েনায়, ১৯৭১।

এমিলিয়ে ও অনিতা, ১৯৪০-এর মাঝামাঝি সময়।

এমিলিয়ে ও অনিতা, ১৯৪০-এর শেষদিকে।

লিখতেন। শরৎচন্দ্র সেইসময়ে বিলেতে আইন পড়তেন (১৯১১-১৯১৩)। এইসব চিঠিপত্রে আমরা দেখতে পাই পরাধীন দেশের জন্য তাঁর তীব্র মর্মবেদনা। সেই বয়সে তিনি বুঝে গিয়েছেন তাঁর জীবন স্বদেশের মুক্তির জন্য বলিপ্রদত্ত।

১৯৩৫ সালের জুন মাসে গলব্লাডার অপারেশনের পরে সুভাষ ভিয়েনা থেকে কার্লোভিভারি স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে গেলেন। ভিয়েনা থেকে প্রাগ পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে গেলেন কমলা নেহরুকে। কমলা তখন তাঁর টিবি রোগের চিকিৎসার জন্য ইউরোপে ছিলেন। জওহরলাল তখন ভারতে কারাবন্দি। মিসেস নেহরুর সঙ্গে ছিলেন ডা. কাটিয়ার। সেপ্টেম্বর মাসে সুভাষ হফগাস্টাইন গেলেন। যাবার পথে তিনি জার্মানিতে বাডেনওয়াইলিয়ের হয়ে গেলেন। সেখানে ছিলেন অসুস্থ কমলা নেহরু। কমলার অবস্থা তখন খুবই খারাপ। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার নেহরুকে জেল থেকে মুক্তি দিলেন। নেহরু স্ত্রীকে দেখতে এলেন। জওহরলাল আর সুভাষ বাডেনওয়াইলিয়ের একটা বোর্ডিং হাউসে একসঙ্গে ছিলেন। কমলার অবস্থা সামান্য ভাল হলে সুভাষ হফগাস্টাইনে ফিরে গেলেন। সেখান থেকে তিনি জওহরলালকে একটি সুন্দর চিঠি লেখেন, তারিখ ৪ অক্টোবর ১৯৩৫। তিনি লেখেন এই সংকটের সময়ে কোনও সাহায্য দরকার হলে জওহরলাল যেন তাঁকে জানাতে দ্বিধা না করেন। ২০ অক্টোবর সুভাষ ভিয়েনাতে ফিরলেন। ফিরবার পথে আবার সুভাষ বাডেনওয়ালিয়েরে নেহরুদের সঙ্গে কাটালেন।

এরপর সুভাষ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ প্যারিস থেকে উনি লসানে এলেন। উনি ঠিক করেছিলেন লসানে নেহরুদের সঙ্গে দেখা করে

উনি রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ভিলেনোভ যাবেন। কিন্তু কমলার অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়াতে তিনি লসানে আটকে গেলেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬-এ কমলার মৃত্যু হল। সুভাষ তাঁর বান্ধবী নাওমি ফেটারকে, আন্টি এমিলিয়েকে চিঠি লিখে জানালেন তিনি কমলার ফিউনারেলের ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। তিনি আরও জানালেন কমলার শেষ কাজ কী সুন্দর শান্ত ও মর্যাদাপূর্ণ হল। কন্যা ইন্দিরা এসে লসানে পৌঁছলেন। কমলার শেষ সময়ে তাঁর শয্যাপার্শ্বে এবং তাঁর শেষ কাজে সুভাষ, জওহরলাল এবং ইন্দিরা একসঙ্গে ছিলেন। কমলার মৃত্যু জওহর আর সুভাষকে খুব কাছাকাছি এনে দিয়েছিল।

আমি নিজে ১৯৭০ সালে ইউরোপে ত্রিশের দশকে নেতাজির কাজ নিয়ে গবেষণা করছিলাম। সেই সময় আমি ইন্দিরা গাঁধীকে চিঠি লিখে জানতে চাই কমলা নেহরুর মৃত্যুর সময়ের কথা। বিশেষ করে নেহরু ও নেতাজির কথা। তাঁর কতদূর মনে আছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা দু'-একদিনের মধ্যে জবাব দেন। তিনি লেখেন, 'আমি মার একেবারে শেষ সময়ে লসানে পৌঁছেছিলাম। আমার তাই বেশি কিছু জানা নেই।' উনি আরও লেখেন তাঁর মনের অবস্থাও তখন খুব খারাপ ছিল। তিনি আমাকে বলেন দিল্লিতে নেহরু মিউজিয়ামে তাঁর বাবা এবং নেতাজির কথোপকথনের কোনও রেকর্ড আছে কি না খুঁজে দেখতে।

১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে সুভাষচন্দ্র ঠিক করলেন উনি ভারতে ফিরে যাবেন। সেই কবে ১৯৩০-এর মার্চ মাস থেকে ইউরোপে নির্বাসনে রয়েছেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ওঁকে জানালেন যে, ফিরে এলে তাঁকে তক্ষুনি গ্রেফতার করে জেলে পুরে দেওয়া হবে। সুভাষের পক্ষে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ল। তিনি রোমাঁ রোলাঁ আর জওহরলালের পরামর্শ

চাইলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নিজেই ঠিক করলেন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবেন এবং দেশে ফিরে যাবেন। এমিলিয়েকে ছেড়ে যেতে তাঁর যে কষ্ট হবে সেই কষ্টের কথা তিনি অবশ্য কারও কাছে প্রকাশ করতে পারলেন না। সুভাষ জানতেন তাঁর জীবন অনিশ্চয়তায় পূর্ণ। এমিলিয়ের সঙ্গে জীবনে আর কখনও দেখা হবে কি না তারও ঠিক নেই। এই গভীর মানসিক দুঃখের সময়ে তিনি আন্টিকে একটি মর্মস্পর্শী চিঠি লেখেন। আন্টি শিশিরকে প্রকাশের জন্য যে চিঠির গোছা দেন তার থেকে এই চিঠিটি আলাদা করে রেখেছিলেন। তার ফলে নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো থেকে যখন এমিলি শেংকলের পত্রাবলি, ১৯৩৪-১৯৪২ প্রকাশিত হল, তখন এই চিঠিটি বাদ পড়ে যায়।

এমিলিয়ে আর সুভাষের প্রথম দেখা হওয়ার ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে শিশির, আমি, সুগত সবাই ১৯৯৪ জুন মাসে আউগসবার্গে গেলাম। সঙ্গে করে নিয়ে এলাম সদ্য প্রকাশিত এমিলিয়ের পত্রাবলি। আন্টি যখন বইটি হাতে নিলেন এক অপার্থিব আনন্দে তাঁর সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অনিতা রোস্ট টার্কিসহ এক আনুষ্ঠানিক ডিনার স্বহস্তে রেঁধেছিল। আমরা ভারত থেকে আন্টির জন্য একটা স্কার্ফ নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটা তাঁর গলায় জড়িয়ে দিলাম। আমরা একটা বাঘের ছবি দেওয়া কার্ডও আন্টিকে দিলাম। আমরা জানতাম সুভাষচন্দ্র মাঝে মাঝেই তাঁকে বাংলায় বাঘিনী বলে সম্বোধন করতেন। আন্টি কার্ডটা খুলে দেখলেন ভিতরে লেখা ছিল 'তুমি গর্জন করতে থাকো', নীচে আমি, শিশির আর আমাদের তিন ছেলেমেয়ে সই করে দিয়েছিলাম। আন্টি হেসে ফেললেন আর বললেন, 'নিশ্চয় গর্জন করতে থাকব।' সেই সন্ধ্যার ছবিটি আমার মনের মধ্যে চিরদিনের মতো আঁকা হয়ে আছে।

My darling! Even the iceberg sometimes melts and so it is with me now. I can no longer restrain myself from penning these few lines to convey my deep love for you – my darling – or as we would say in our own way – the queen of my heart. But do you love me – do you care for me – do you long for me? You called me "pranadhik" – but did you mean it? Do you love me more than your own life? Is that possible? With us it may be possible – for a Hindu woman has, for centuries, given up her life for the sake of her love. But you Europeans have a different tradition. Moreover, why should you love me more than your own life? I am like a wandering bird that comes from afar, remains for a while, and then flies away to its distant home. For such a person why should you cherish so much love –

My dearest! In a few weeks I must fly to my distant home. My country calls me – my duty calls me – I must leave you and go back to my first love – my country. So often have I told you that I have already sold myself to my first love. I have very little left to give to any one. What little I have – I have given you. It may not be worthy of you and of your great love for me – but that is all that I have to give – and you cannot expect anything more from me.

I do not know what the future has in store for me. May be, I shall spend my life in prison. May be, I shall be

এমিলিয়েকে লেখা সুভাষের প্রেমপত্র, প্রথম পৃষ্ঠা, মার্চ ১৯৩৬।

shot or hanged. But whatever happens, I shall think of you and convey my gratitude to you in silence for your love for me. May be I shall never see you again – may be I shall not be able to write to you again when I am back – but believe me, you will always live in my heart, in my thoughts and in my dreams. If fate should thus separate us in this life – I shall long for you in my next life. And if you believe in my religion – pray similarly.

My angel! I thank you for loving me and for teaching me to love you.

My sweetest! Be a good girl, be a pure girl – and above all, be unselfish. Care not for any sorrow or suffering that may come. Sorrow and suffering cannot make you unhappy if you are unselfish. If you are selfish, nothing can make you happy. This is the only advice I can give you – your "guru" (I think you once called me as such). I hate selfishness and I dislike selfish people. You have an unselfish heart – that is why I could love you. Make that heart more and more unselfish and you will increase your happiness in this life and after.

My queen! Should we not meet again after I leave Europe, think kindly of me. Do not blame me for not loving you more. I have given what I had – how can I give more? With these lines, I send you the tears that

এমিলিয়েকে লেখা সুভাষের প্রেমপত্র, দ্বিতীয় পৃষ্ঠা, মার্চ ১৯৩৬।

are now flowing.

I never thought before that a woman's love could enthrall me. So many did love me before, but I never looked at them. But you, naughty woman, have caught me. And why?

Is this love of any earthly use? We who belong to two different lands — have we anything in common? My country, my people, my traditions, my habits and customs, my climate — in fact everything — is so different from yours. Then, why do you love? And what is it that you love? What is there in me that attracts you and compels you to love? Can you tell.

For the moment, I have forgotten all these differences that separate our countries. I have loved the woman in you — the soul in you. You are the first woman I have loved. God grant that you may also be the last. Adieu, my dearest!

Please destroy after perusal

এমিলিয়েকে লেখা সুভাষের প্রেমপত্র, তৃতীয় পৃষ্ঠা, মার্চ ১৯৩৬।

পরদিন সকালে আন্টি আমার হাতে এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ দিয়ে বললেন, 'কৃষ্ণা, এটা তোমার জন্য। আমি এটা তোমাকে দিলাম।' অবাক হয়ে গিয়ে আমি হাতে ধরা জীর্ণ কাগজের টুকরোটার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটা কী?' আন্টি জবাব দিলেন 'এটা একটি প্রেমপত্র।' সত্যিই এটি একটি অপূর্ব প্রেমপত্র। পত্রটি পড়ে আমার মন গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে গেল।

চিঠিতে কোনও তারিখ নেই কিন্তু খামের ওপর পোস্ট অফিসের ছাপ ৫ মার্চ ১৯৩৬।

সুভাষ এমিলিয়েকে লিখলেন, 'জানি না আমার ভাগ্যে ভবিষ্যতে কী আছে। হয়তো আমার সারাজীবন কারাগারে কাটবে, হয়তো আমাকে গুলি করে হত্যা করা হবে, হয়তো বা আমার ফাঁসি হবে।' উনি লিখে চললেন, 'হয়তো তোমার সঙ্গে এজীবনে আর দেখা হবে না, দেশে ফিরে গেলে হয়তো তোমাকে আর চিঠিও লিখতে পারব না, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো তুমি সর্বদা আমার হৃদয়ে থাকবে, আমার চিন্তায়, আমার স্বপ্নে থাকবে।'

এরপর তিনি এমিলিয়ের কাছে শপথ করলেন, 'যদি ভাগ্য আমাদের এই জীবনে বিচ্ছিন্ন করে দেয় আমি পরজন্মে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।'

এই ঐতিহাসিক চিঠিটি এমিলিয়ের পত্রাবলিতে ছাপা হয়নি। এরপরেই 'জরুরি কিছু লেখা' প্রকাশিত হল। সেই বইটিতে চিঠিটি মুদ্রিত হল। এই চিঠিতে সুভাষচন্দ্র এমিলিয়ের উদ্দেশে আরও লিখলেন, 'তোমার অন্তরের যে নারীসত্তা তাকে আমি ভালবেসেছি, তোমার অন্তরাত্মাকে আমি ভালবেসেছি।' এত কথা লেখার পর চিঠির শেষে সুভাষচন্দ্র একটি

নির্দেশ দিলেন, 'চিঠিটি পড়া হয়ে গেলে নষ্ট করে ফেলো।' সুভাষ আর এমিলিয়েকে সবসময় মনে রাখতে হত একদিকে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা আর অন্যদিকে হিটলারের নাৎসি সরকার তাদের উপর নজরদারি করছে। আমাদের ভাগ্য ভাল আন্টি সুভাষের নির্দেশ অমান্য করেছিলেন।

সুভাষ আর এমিলিয়ে কোনওমতে দশটি দিন ১৭ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ ১৯৩৬ বাদগাস্টাইনে একসঙ্গে কাটাতে পেরেছিলেন। তারপরেই ছিল দীর্ঘ বিচ্ছেদ। সুভাষ এমিলিয়েকে বাদগাস্টাইনে আসতে অনুরোধ করেছিলেন। 'তোমার বাবা-মা তোমাকে আসতে অনুমতি দেবেন তো?' তাঁরা দু'জনে ক্যুর হাউস হকল্যান্ড নামে একটি স্পা গেস্ট হাউসে থাকতেন। ছবির মতো সুন্দর বাদগাস্টাইনের পাহাড়ি পথে দু'জনে হাঁটতে যেতেন। কখনও হেঁটে গিয়ে 'Gruner Baum' রেস্তোরাঁতে কফি খেতেন। 'Gruner Baum' এখন একটি বড়সড় হোটেল। ২০০৮ সালের গ্রীষ্মকালে অনিতা, মার্টিন, সুগত, সুমন্ত্র আর আমি আউগসবার্গ থেকে বাদগাস্টাইন গিয়েছিলাম। তখন আমরাও সকলে 'Gruner Baum'-এ বসে কফি খেয়েছি।

দীর্ঘ বিচ্ছেদ

সুভাষের জাহাজ 'conte verde' বম্বে পৌঁছল ৮ এপ্রিল ১৯৩৬। জাহাজ থেকে অবতরণ করা মাত্র তাঁকে গ্রেফতার করে আর্থার রোড কারাগারে নিয়ে যাওয়া হল। পরে সেখান থেকে তাঁকে পুণের য়ারবেদা জেলে সরিয়ে নেওয়া হয়।

এমিলিয়েকে তাঁর নিজের খবর কীভাবে দেবেন সুভাষ এক ফন্দি বার করলেন। তিনি জেল থেকে এমিলিয়েকে একটা চিঠি লিখলেন যে, সব ওষুধপত্র সঙ্গে আনতে ভুলে গেছেন। এরপর জেলের সুপারিনটেনডেন্টকে অনুরোধ করলেন— এই চিঠিটি যেন যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সেন্সর করিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য সুভাষ 'conte verde' জাহাজ থেকেও নিয়মিত এমিলিয়েকে চিঠি লিখেছেন।

ভারতের গরমে সুভাষের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। তখন তাঁকে তাড়াতাড়ি দার্জিলিং-এর কাছে কার্শিয়াং শহরে বদলি করা হল। সুভাষ এমিলিয়েকে জানালেন যে কার্শিয়াং-এ তাঁর মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসুর একটি বাংলো আছে, সেখানে তাঁকে হোম-ইন্টার্ন অর্থাৎ গৃহবন্দি করা হয়েছে। গৃহবন্দি কাকে বলে উনি আন্টিকে বুঝিয়ে দিলেন। সুভাষচন্দ্র ওই বাংলোতে একক বন্দি হিসেবে ছিলেন। সুভাষের সব চিঠিপত্র দার্জিলিং-এর পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টকে পাঠাতে হত। তিনি সেন্সর করে পাশ করতেন।

আন্টি কোনওদিন কার্শিয়াং বলে কোনও শহরের নাম শোনেননি। সুভাষ তাঁকে বললেন, একটা ম্যাপ খুলে দার্জিলিং খুঁজে বার করো। এরপরে প্রায় কুড়ি মাস ধরে সুভাষ আর এমিলিয়ে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ বজায় রেখে চললেন। সুভাষকে লেখা এমিলিয়ের যে ক'খানা চিঠি পরে শিশিরের হাতে এসেছিল সেগুলি এই সময়ে লেখা।

ভিয়েনা থেকে আন্টি কতরকম টুকিটাকি খবর যে পাঠাতেন। উভয়পক্ষে চিঠিগুলো খুব ফরম্যাল রাখতে হত। সব চিঠি তো পুলিশ খুলে পড়বে, তবে ওরই মধ্যে খুব সূক্ষ্ম আদান-প্রদান চলত। দু'জনেই দু'জনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। আন্টি ফরাসি ভাষা শিখছেন আর ওদিকে সুভাষ শিখছেন জার্মান ভাষা। সুভাষ জানাচ্ছেন জার্মান ভাষায় তেমন কিছু অগ্রসর হতে পারেননি। সুভাষ লিখছেন, এই একাকী জীবনে জার্মান গ্রামার-এর চাইতে আর একটু ভাল কিছু পড়তে ইচ্ছা হয়। কবি কালিদাসের সংস্কৃত নাটক শকুন্তলা পড়ে জার্মান কবি ও নাট্যকার গ্যেটে একটি সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন। তিনি আন্টিকে সেই কবিতাটি খুঁজে বার করতে বলছেন। তিনি আন্টিকে কবিতাটির কয়েক লাইন ইংরেজি অনুবাদ পাঠালেন আর বললেন মূল জার্মানটি আন্টি যেন তাঁকে পাঠান।

'Wouldst thou the young years' blossoms and the fruits of
its decline;
And all whereby the soul is enraptured, feasted, fed;
Wouldst thou the heaven and earth in one sole name-combine.
I name thee oh Shakuntala! and all at once is said.'

কার্শিয়াং-এ গৃহবন্দি অবস্থায় সুভাষের একাকিত্ব অল্পদিনের জন্য ঘুচল। তাঁর দুই ভাইপো শিশির আর অমিয়কে দু'সপ্তাহর জন্য ওঁর সঙ্গে কাটাতে অনুমতি দেওয়া হল। সুভাষ বাংলোর নীচের রাস্তা হিল কার্ট রোড ধরে দু'দিকে একমাইল পর্যন্ত হাঁটার অনুমতিও পেলেন। শিশির বসু তাঁর 'বসুবাড়ি' বইতে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে হাঁটার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন। 'বসুবাড়ি' বইটি বাংলাতে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। পাঠকমহলে বইটি প্রচুর সমাদৃত হয়েছিল। শিশির নিজে পরে এটি আবার ইংরেজিতে লিখেছিলেন। ইংরেজি বই— 'The Bose Brothers: An Intimate Memoir' ২০১৬ সালে প্রকাশিত।

ভাইপোরা চলে যাবার পর সুভাষ এমিলিয়েকে লিখলেন, আমি আবার একাকী হয়ে পড়েছি। একা থাকা যে খুব খারাপ তা নয়, তবে প্রাণটা মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠে। উনি একটা গ্রামোফোন জোগাড় করলেন আর ইংরেজি ধ্রুপদী ইউরোপীয় সংগীত শুনতে লাগলেন। এমিলিয়েকে লিখলেন ভাল মিউজিক রেকর্ডের একটা লিস্টি যেন পাঠিয়ে দেন। ওঁরা দু'জনেই নিজেদের চারিপাশের খুব ফোটোগ্রাফ তুলতেন আর পরস্পরকে পাঠিয়ে দিতেন। বিজয়ার সময় আর ক্রিসমাসের সময় দু'জনে প্রীতি-সম্ভাষণ বিনিময় করতেন। এমিলিয়ে লিখলেন, আমি আর আমার বাবা-মা তোমার বিজয়ার সম্ভাষণ পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। তুমিও আমাদের প্রীতি-সম্ভাষণ নিয়ো (অবশ্য যদি একজন অহিন্দু বিজয়া সম্ভাষণ জানাতে পারে)।

দেখে মজা লাগে যে, সুভাষ এমিলিয়েকে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর জটিল মামলার খবর বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছেন। মাঝে মাঝে আবার খবরের কাগজের কাটিংও পাঠাচ্ছেন। দু'জনের মধ্যে আবার আধ্যাত্মিক আলোচনাও হচ্ছে। সুভাষ এমিলিয়েকে গীতা পাঠ করতে বলছেন, অবশ্য

ওঁর একটু শক্ত লাগতে পারে। এমিলিয়ের আধ্যাত্মিক ব্যাপারে যথেষ্ট ঔৎসুক্য আছে, কিন্তু উনি স্পষ্ট বলছেন ওঁর সংসার ত্যাগ করার কোনও বাসনা নেই। ওঁর মতে সংসারে থেকেও অনেক ভাল কাজ করা যায়। সুভাষ এমিলিয়েকে বলছেন ভগবৎ গীতার একটি জার্মান অনুবাদ সংগ্রহ করো। ভগবৎ গীতা হল আমাদের বাইবেল। দ্বিতীয় অধ্যায়টি সবচেয়ে মূল্যবান, সেখানে কর্মযোগের কথা বলা হয়েছে। কর্মের ভিতর দিয়েই পূজা হল প্রকৃত সাধনা।

নভেম্বর মাস থেকে কার্শিয়াং-এ প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ল। দুর্বল শরীরে সুভাষের ঠান্ডা সহ্য হল না। খুব তাড়াতাড়ি তাঁকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বন্দি হিসেবে স্থানান্তর করতে হল। ১৯৩৭ সালের নতুন বছরের সম্ভাষণ এমিলিয়েকে হাসপাতাল থেকে পাঠালেন। দু'জনের পত্রালাপ চলতে লাগল। সুভাষ জানালেন কার্শিয়াং-এর একাকী বন্দিদশার থেকে কলকাতায় তিনি অনেক বেশি ভাল আছেন। কলকাতায় তাঁর বৃদ্ধা মাকে সপ্তাহে দু'দিন দেখতে যাবার অনুমতি মিলেছে।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে ১৭ মার্চ ১৯৩৭ সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দেওয়া হল। পরদিনই তিনি এমিলিয়েকে চিঠিতে সুখবর জানালেন। তবে তিনি এমিলিয়েকে সাবধান করলেন যে, যদিও তিনি বন্দি নন পুলিশ কিন্তু তাঁর সব চিঠিপত্র খুলে দেখবে। এমিলিয়ে সুভাষের মুক্তির খবর ভিয়েনার সব বন্ধুদের জানালেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মিসেস নাওমি ফেটার। সুভাষ এমিলিয়েকে বললেন মিসেস কিটি কুর্টিকেও যেন বার্লিনে খবরটা দেওয়া হয়। মুক্তির পরেই সুভাষ খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। লোকের ভিড় লেগেই থাকত। সুভাষের শরীরটা কিন্তু ভাল ছিল না। লাংস লিভারের অসুখে কষ্ট পাচ্ছিলেন। এমিলিয়ে উৎসাহ দিয়ে চিঠি লিখতেন, মুক্তি পাওয়ার ফলে

নিশ্চয় ওঁর স্বাস্থ্য ভাল হবে। যত ব্যস্ততাই থাক দু'জনেই প্রতিজ্ঞা করলেন প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত চিঠি লিখবেন।

ডাক্তারেরা বললেন ১৯৩৭-এর গ্রীষ্মকালটা বিশ্রামের জন্য সুভাষকে কোনও পাহাড়ি শহরে পাঠানো হোক। সুভাষ পঞ্জাবের (এখনকার হিমাচল প্রদেশের) ডালহৌসি পাহাড়ে গেলেন। আন্টিকে বললেন একটা ম্যাপ খুলে তাঁর যাত্রাপথ দেখে নিতে। প্রথমে গেলেন এলাহাবাদ, তারপর লাহোরে কয়েকদিন কাটালেন। ডালহৌসিতে তিনি ড. ধরমবীর এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের বাড়িতে কাটালেন। ধরমবীর দম্পতিকে তিনি ছাত্র অবস্থায় ইংল্যান্ডে থাকার সময় থেকে চিনতেন। শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া ধরমবীর, ইংরেজ মহিলা সুভাষকে খুব স্নেহ করতেন। সুভাষ তাঁকে দিদি ডাকতেন। এই ধরমবীররা কারা এমিলিয়ের কোনও ধারণা ছিল না। তিনি জানতে চাইলেন সুভাষ কি কোনও স্যানেটোরিয়াম-এ আছেন। সুভাষ বুঝিয়ে লিখলেন এঁরা অনেকদিনের বন্ধু, উনি এঁদের অতিথি হয়ে এঁদের গ্রীষ্মাবাসে আছেন।

মনে হয় কারামুক্ত থাকার ফলে সুভাষের সাহস বেড়েছে। মাঝে মাঝেই চিঠিপত্রে জার্মান ভাষায় ভালবাসার কথা লিখছেন। ২২. ০৫. ৩৭ লেখা একটি চিঠিতে চুপিচুপি দু'লাইন জার্মান ঢুকিয়ে দিয়েছেন। অনুবাদ করলে তার অর্থ, 'তুমি কি আমাকে ভুলে গিয়েছ? এত কম চিঠি লেখ কেন? আমি তোমার চিঠির আশায় থাকি— তুমি কি সেকথা জানো না?' এরপরের একটি তারিখবিহীন চিঠি আছে, পুরো চিঠিটা বড় হাতের অক্ষরে লেখা। এই চিঠিটি ফ্রাউ লোয়ি (Frau Lowy) নামে এক বান্ধবীর হাতে কার্লোভিভারিতে পোস্ট করিয়েছিলেন। বড় হাতের অক্ষরে সুভাষ লিখলেন—

'এমন একটা দিন যায় না যেদিন আমি তোমার কথা চিন্তা না করি। তুমি সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে রয়েছ।' উনি আরও লিখলেন, 'ভবিষ্যতে আমি কী করব আমি জানি না। আমি কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না। আমি যে গত কয়েক মাস ধরে কত একাকী আর কত দুঃখী বোধ করেছি তা বলে বোঝাতে পারব না।' উনি আন্টিকে অনুরোধ করলেন যেন সহজ জার্মান ভাষায় ওঁকে একটা চিঠি লেখেন, উনি বুঝতে পারবেন। কিন্তু চিঠিতে যেন সই না করেন আন্টি। এরকম একটা চিঠি ওঁকে লিখেছিলেন, তবে সে চিঠিটা পাওয়া যায়নি। কিন্তু সুভাষ চিঠিতে জানাচ্ছেন যে, উনি চিঠিটা পেয়েছেন আর জার্মান ভাষা বুঝতে পেরেছেন।

একটা বেশ কৌতূহলজনক চিঠিতে এমিলিয়ে সুভাষকে জানালেন ডা. বিধান রায় ভিয়েনাতে এসেছেন। সঙ্গে এসেছেন তাঁর বউদি আর ভাইঝি রেণু এবং আরও কয়েকজন। এমিলিয়ে মহিলাদের ভিয়েনা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন আর বিধান রায়ের জন্য কিছু টাইপিং-এর কাজও করছেন। মনে হয় উনি ভারতীয়দের সঙ্গ বেশ উপভোগ করছেন। রেণু ভিয়েনার রান্না শিখতে চায়। ডা. রায় এমিলিয়েকে বড় এলাচ আর পান দিয়েছেন। উনি এখন এলাচ আর পান খাচ্ছেন। সুভাষের বাঙালি পোশাক পরা একটা ফোটোগ্রাফ উনি পেয়েছেন। উনি জিজ্ঞাসা করছেন শার্টের হাতা অত লম্বা কেন, নাইট গাউনের মতো লাগছে। সুভাষ ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন ভারতীয় পাঞ্জাবি বা শার্ট ওইরকমই হয়।

ডালহৌসিতে থাকার সময়ে সুভাষের জার্মান ভাষায় দখল বেশ বেড়ে গেল। আগস্ট আর সেপ্টেম্বর মাসে উনি এমিলিয়েকে লম্বা লম্বা চিঠি জার্মান ভাষায় লিখছেন আর ওঁকে জার্মান ভাষায় উত্তর দিতে বলছেন। সুভাষের জার্মান জ্ঞান সম্পর্কে এমিলিয়ের কী ধারণা তাও জানতে চাইছেন।

ভিয়েনার সব বন্ধুদের খবর উনি জানতে চাইতেন। মিসেস নাওমি ফেটার, মিসেস হেডি ফুলপ-মিলার। মি. অটো ফালটিস, মিসেস হারগ্রোভ, ওঁর সার্জেন ডা. ডেমেল সবাই কেমন আছেন। আন্টি সব খবরাখবর ওঁকে জানাতেন। ডালহৌসিবাসের কাল শেষ হলে পর কলকাতাগামী ট্রেনে বসে সুভাষ এমিলিয়েকে চিঠি লিখলেন।

৪ নভেম্বর, ১৯৩৭ সালে সুভাষ এমিলিয়েকে আবার বড় হাতের অক্ষরে ধরে ধরে চিঠি লিখলেন। এবার জার্মান ভাষায় চিঠিতে উনি সম্বোধন করছেন, 'ডিয়ার গ্রেশাস ইয়ং লেডি'। উনি এমিলিয়েকে জানালেন নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে উনি ইউরোপ আসবেন। উনি যে বাদগাস্টাইন যাবেন সেকথা খুব গোপনীয়তার সঙ্গে জানাচ্ছেন। উনি এমিলিয়েকে বলছেন ওঁরা দু'জনে ক্যুর হাউস হকল্যান্ড গেস্ট হাউসে পাঁচ সপ্তাহ থাকবেন তার ব্যবস্থা যেন করেন। এই খবরটা এমিলিয়ে যেন অন্য কাউকে না জানান। অবশ্য ওঁর বাবা-মাকে বলতে পারেন। সুভাষ পৌঁছবার আগেই এমিলিয়ে যেন বাদগাস্টাইন পৌঁছে যান এবং বানহফ অর্থাৎ রেলস্টেশনে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। এই চিঠির উত্তর উনি যেন না দেন। সুভাষ কবে পৌঁছবেন তা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেবেন।

সুভাষ আর এমিলিয়ের জীবনকাহিনিতে ১৯৩৭ সালের শীতকালে বাদগাস্টাইনে বসবাস এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এক দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর এঁরা দু'জন তাঁদের প্রিয় পাহাড়ি শহর বাদগাস্টাইনে মিলিত হলেন। শীতকালের বাদগাস্টাইন তখন বরফে ঢাকা। প্রথমে কয়েকদিন এমিলিয়ের সাহায্য নিয়ে সুভাষ তাঁর আত্মজীবনীর দশটি অধ্যায় লিখে ফেললেন। এই বইটি হল 'ইন্ডিয়ান পিলগ্রিম' বা 'ভারত পথিক' নামে অসমাপ্ত আত্মজীবনী। এই বইতে তিনি ১৯২১ সালে তাঁর ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে

পদত্যাগ পর্যন্ত লেখেন। এই শীতকালে বাদগাস্টাইনে বেশ কয়েকজন ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তবে সকলেই খুব অল্প সময় ছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন নাম্বিয়ার, হেডি ফুলপ-মিলার আর ভ্রাতুষ্পুত্র অমিয়। তবে এর মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অতিথি ছিলেন চেট্টিয়ার (A. K. Chettiar)। চেট্টিয়ার হলেন একজন খ্যাতনামা ফোটোগ্রাফার এবং চিত্র-পরিচালক। সেই সময়ে তিনি গাঁধীজির ওপর একটি ফিলম তৈরি করছিলেন। নেতাজির সঙ্গে বাদগাস্টাইনে কয়েকদিন কাটানোর এক চমৎকার বর্ণনা তিনি লিখে গেছেন। লেখাটি পরবর্তীকালে নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর 'অর‍্যাকল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। চেট্টিয়ার যেভাবে গৃহকর্তা নেতাজি অতিথিদের যত্ন নিয়ে দেখাশোনা করতেন তা দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। চেট্টিয়ার যখন ক্যুর হাউস হকল্যান্ডে পৌঁছলেন নেতাজি ওঁকে সঙ্গে নিয়ে ওপরে তাঁর ঘরে এলেন, তারপর নেতাজি নিজে তাঁর শোবার ঘরে আর বাথরুমে সব ঠিকঠাক আছে কি না দেখলেন। পরদিন প্রচণ্ড শীতের মধ্যে বাড়ির বাইরে ছবি তোলার সময় চেট্টিয়ারের আঙুল ঠান্ডায় অবশ হয়ে গিয়েছিল। নেতাজি তাঁর নিজের রুমাল দিয়ে আঙুলের পরিচর্যা করতে লাগলেন। ফিরে যাবার টিকিট কাটার জন্য চেট্টিয়ারকে পাশের শহর, খুব সম্ভবত হফগাস্টাইন যেতে হল। সারা পথ তো বরফে ঢাকা। নেতাজি সকলে মিলে স্লেজে চড়ে পাশের শহরে যাবার ব্যবস্থা করলেন। বাদগাস্টাইনে ফিরে আসার সময় নেতাজি সকলকে স্লেজে চড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমরা চলে যাও আমি হেঁটে ফিরব।' নেতাজির ফিরে আসতে অনেক দেরি হয়েছিল। উনি ফিরে না আসা পর্যন্ত সকলে গভীর উদ্বেগে ছিলেন। যাই হোক, চেট্টিয়ার এসেছিলেন বলে আমরা বাদগাস্টাইনের এই ঐতিহাসিক দিনগুলির অনেক ফোটোগ্রাফ পেয়েছি।

১৯৫০-এর প্রথমদিকে এমিলিয়ে ও অনিতা।

কলকাতা বিমানবন্দরে অনিতা ও মার্টিনকে স্বাগত জানাচ্ছেন শিশির, আগস্ট ১৯৭৯।

শিশির ও অনিতা কলকাতা বিমানবন্দরে, আগস্ট ১৯৭৯।

শিশির, কৃষ্ণা ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কে ভি রঘুনাথ রেড্ডি, নেতাজিভবনে পত্রাবলির সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান উপলক্ষে, কলকাতা ১৯৯৪।

এমিলিয়ে ও শিশির অনিতার বাড়ি স্টাটবার্গেন আউগসবার্গ-এ, জুন ১৯৯৪।

ঞ্চা, অনিতা ও মার্টিন অস্ট্রিয়ার বাদগাস্টাইনে ক্যুর হাউস কলান্ডের সামনে, জুন ২০০৮।

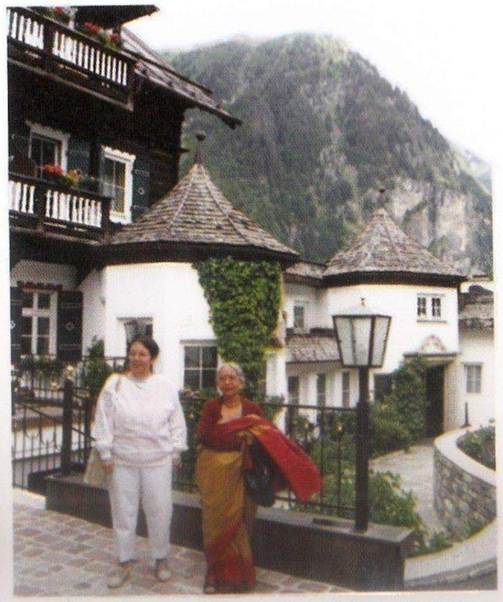

কৃষ্ণা ও অনিতা অস্ট্রিয়ার বাদগাস্টাইনে গ্রুনার বাউম রিসর্ট-এর সামনে, জুন ২০০৮।

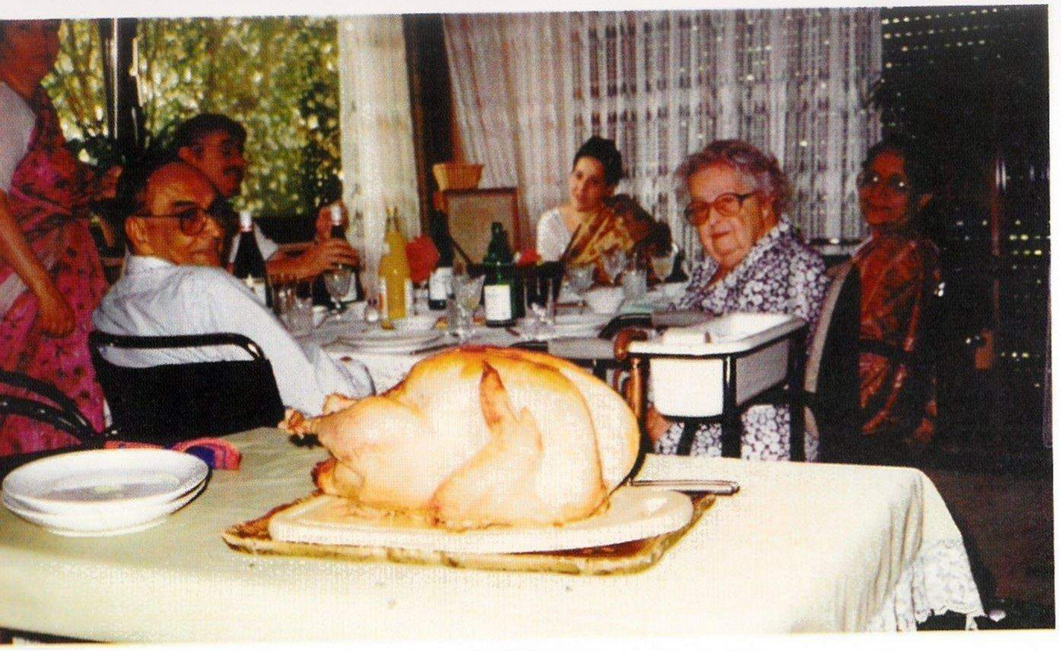

এাবলির গ্রন্থপ্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত রোস্ট-টার্কি নৈশভোজে, জুন ১৯৯৪।

এমিলিয়ে-সুভাষের পত্রাবলির সংকলনগ্রন্থ হাতে, এমিলিয়ে, জুন ১৯৯৪।

ভিয়েনায় শিশির, কৃষ্ণা ও এমিলিয়ে, অক্টোবর ১৯৮৭।

এমিলিয়ে, কৃষ্ণা, সুমন্ত্র ও হেলা শর্মা, অক্টোবর ১৯৮৭।

এমিলিয়ে, অনিতা ও অনিতার কন্যা মায়া আউগসবার্গে-এর স্টাটবার্গেন-এ তাঁদের বাড়িতে, জুন ১৯৯৪।

এমিলিয়ে ও কৃষ্ণা, আউগসবার্গ-এর স্টাটবার্গেন-এ, জুন ১৯৯৪।

নেতাজিভবনে এমিলিয়ের স্মরণসভায় বক্তৃতারত শিশির বসু, কলকাতা, মার্চ ১৯৯৬।

বহু বছর পরে আন্টি এমিলিয়ে জানালেন যে, ১৯৩৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর, সেদিন আবার এমিলিয়ের ২৭তম জন্মদিন ছিল— বাদগাস্টাইনে ওঁরা দু'জন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং দু'জনেই প্রতিজ্ঞা করেন এই বিবাহের কথা তাঁরা একান্ত গোপন রাখবেন। কী কারণে এই গোপনীয়তা জানি না। আমার মনে হয় আন্টির দিক থেকে এ এক বিরাট আত্মত্যাগ। সুগতকে যখন আন্টি বলেন ওঁরা একটা অযথা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হোক চাননি, তখন আন্টি বোঝাতে চেয়েছিলেন সুভাষকে উনি তাঁর প্রথম প্রেম স্বদেশের কাজে পূর্ণ-স্বাধীনতা দিতে চান।

২০০৮ সালের গ্রীষ্মকালে সুগত, সুমন্ত্র আর আমি আউগসবার্গে অনিতা আর মার্টিনের সঙ্গে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলাম। সুগত একদিন বলল, 'চলো আমরা বাদগাস্টাইন ঘুরে আসি।' সুগত গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলল, সঙ্গে অনিতা, মার্টিন, সুমন্ত্র আর আমি। জার্মানির সীমানা পার হয়ে আমরা অস্ট্রিয়াতে প্রবেশ করলাম। সীমান্ত পার হতে হবে শুনে আমি তো পাসপোর্ট ইত্যাদি হাতে নিয়ে তৈরি। সীমান্তরক্ষীরা আমাদের পাত্তাই দিল না। একটু হাত নেড়ে চলে যেতে বলল। একটু পরে আমরা পাহাড়ি পথে বাদগাস্টাইনের দিকে উঠতে লাগলাম। সে পথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এক কথায় অপূর্ব। কয়েকঘণ্টা পর আমরা বাদগাস্টাইন পৌঁছে গেলাম। চারিদিকে বরফে ঢাকা পাহাড়ের মাঝখানে এক ছবির মতো সুন্দর ছোট্ট শহর।

গাড়ি থেকে নেমে যেখানে দাঁড়ালাম সেখানে লেখা মোৎসার্ট প্লাজা, বাঁদিকে একটি সুন্দর স্ট্যাচু। স্ট্যাচু থেকে গড়িয়ে উষ্ণ প্রস্রবণের জল। আমি সেই জলে হাত ধুয়ে নিলাম। উলটোদিকে মোৎসার্ট রেস্তোরাঁতে ঢুকে লাঞ্চের অর্ডার দিলাম। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন কী খাবেন। এখানে

নানারকম অস্ট্রিয়ান পদ আছে। অনেকে পাহাড়ে ট্রেকিং করতে আসেন, তাঁদের জন্য স্পেশাল স্বাস্থ্যকর খাবার আছে। আমি স্পেশাল খাবার অর্ডার করলাম, অন্যরা রকমারি। পরে দেখা গেল রকমারি খাবার খুবই সুস্বাদু, আমার মশলাপাতি ছাড়া স্বাস্থ্যকর খাবার কিঞ্চিৎ বিস্বাদ। খাবার টেবিলে বসে আমরা আলোচনা করলাম বাদগাস্টাইন যখন এসেছি তখন এমিলিয়ে আর সুভাষ যেখানে থাকতেন সে জায়গাটি অবশ্যই দেখতে হবে। আমার হঠাৎ কী যে হল, কিছুতেই গেস্ট হাউসের নামটা মনে করতে পারছি না। আমার মোবাইলে কলকাতার নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোতে ফোন করলাম। আমাদের কর্মী মনোহর ফোন ধরল। ওকে বললাম, অফিসে কাউকে দাও, বাদগাস্টাইনে নেতাজি কোথায় থাকতেন আমাকে জানাতে বলো। মনোহর জানালে কলকাতায় প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়েছে। এলগিন রোডে হাঁটুর ওপরে জল, কেউ অফিসে পৌঁছতে পারেনি। শুনে আমরা সবাই হতাশ। মিনিট দশেক পরে আমার মোবাইল বেজে উঠল। মনোহর বললে লাইব্রেরিতে ঢুকে একটা বই বার করেছি। নেতাজির অনেক চিঠি আছে বইটিতে। চিঠির ওপরে ঠিকানা লিখেছেন ক্যুর হাউস হকল্যান্ড। আমাদের মধ্যে এক আনন্দের কলরব উঠল।

সুগত তার গাড়িতে উঠে স্যাটেলাইট যন্ত্রকে পথনির্দেশ দিল, অমনি এক কণ্ঠস্বর বলতে শুরু করল বাঁদিকে যাও, ডানদিকে যাও, এবার সোজা খানিকক্ষণ চলো। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর কণ্ঠস্বর ঘোষণা করলে, 'তোমরা তোমাদের গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছ।' অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখলাম গাড়ি একটি সুদৃশ্য তিনতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির গায়ে লেখা ক্যুর হাউস, হকল্যান্ড। একতলায় একটি কাফে রয়েছে। তবে কাফে বন্ধ, লোকজন নেই। নীরব তিনতলা বাড়িটি আমাদের কেমন যেন আচ্ছন্ন করে

ফেলেছিল। সুমন্ত্র প্রথম ঘোর লাগা ভাবটি কাটিয়ে বাড়ির দিকে অগ্রসর হল। সে দু'পা এগিয়ে যেতেই এক বিশাল অ্যালসেশিয়ান কুকুর বাগানের দিকের গেটের কাছে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এল।

আমার হঠাৎ মনে হল আমি যেন ফিরে গিয়েছি অতীতে, দাঁড়িয়ে আছি সত্তর বছর আগের ১৯৩৭-১৯৩৮ সালের শীতকালের বাদগাস্টাইনে। আসলে আমি এক অ্যালসেশিয়ান কুকুরের গল্প আন্টির কাছে অনেকবার শুনেছি আর ফোটোগ্রাফও দেখেছি। বরফে ঢাকা রূপকথার মতো সুন্দর বাদগাস্টাইনে এমিলিয়ে ও সুভাষের সঙ্গে মস্ত বড় অ্যালসেশিয়ান কুকুর। আন্টি গল্প করতেন। 'আমরা দু'জনে পাহাড়ের পথে হাঁটতে বার হতাম। কিছু দূর গিয়ে আমি অনেক সময় ক্লান্ত বোধ করে বাড়ির দিকে ফিরতাম। তোমাদের আঙ্কল কিন্তু এগিয়ে যেতেন। তখন আমাদের অ্যালসেশিয়ান কুকুর একবার আমার দিকে আর একবার সুভাষের দিকে তাকাত, বেচারা বুঝে উঠতে পারত না কাকে সে অনুসরণ করবে।'

কুকুরের ডাক এবং একটা হইচই শুনে এক মেমসাহেব ক্যুর হাউসের দরজা খুলে বাইরে এলেন। বাইরে একদল লোক দেখে তিনি বেশ অবাক হলেন। আরও অবাক হলেন যখন শুনলেন, সত্তর বছর আগে আমাদের কোনও আত্মীয়েরা এখানে ছুটি কাটাতে এসে বসবাস করতেন, তাই আমরা এ বাড়ি দেখতে এসেছি। তিনি বললেন, পরেরবার এলে আমরা যেন ক্যুর হাউস হকল্যান্ডে উঠি। তিনি জানালেন তিনি এই গেস্ট হাউসের বর্তমান মালিক। আগের মতো এখনও অতিথিরা এখানে বসবাস করেন। অনিতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, এখান থেকে গ্রুনের বম (Gruner Baum) কফি হাউসে কীভাবে যাব পথনির্দেশ দেবেন। সুভাষ আর এমিলিয়ে প্রায়ই এই কফি হাউসে যেতেন। মেমসাহেব আমাদের পথ বলে দিলেন। আমরা

এবার গ্রুনের বম (Gruner Baum) পৌঁছে গেলাম। এই কফি হাউসটি এক অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত। এর সৌন্দর্য আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলল। আমরা রেস্তোরাঁর ভেতরে না বসে বাইরে বসে কফি খাব ঠিক করলাম। সবুজ গালিচার মতো ঘাসে ঢাকা মাঠে ছোট টেবিল ঘিরে চেয়ারে আমরা বসলাম। এখন গ্রীষ্মকাল, চারিদিকে রঙিন ফুল ফুটে আছে। চারিপাশ সুউচ্চ পাহাড়ে ঘেরা। নীল আকাশের গায়ে বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়া। কোনও কোনও চূড়া থেকে সরু ধারায় বরফ আইসক্রিমের মতো গলে পড়ছে। আমরা কফিতে চুমুক দিলাম। সুমন্ত্র শখ করে এক মগ Grumer Vedliner নামে উৎকৃষ্ট অস্ট্রিয়ান ওয়াইন নিয়ে বসল। আমরা রোমাঞ্চিত হয়ে বলাবলি করলাম, কে জানে এই টেবিলে বসে হয়তো একদিন এমিলিয়ে আর সুভাষ কফি পান করেছেন আর নিভৃত আলাপচারিতা করেছেন।

আমরা ছোট শহরটি ঘুরেফিরে দেখতে বার হলাম। শহরের মাঝখানে কিছু দোকান বাজার। চেয়ে দেখি একটি দোকানের নাম মহারানি লেখা আছে। এখানে ইন্ডিয়ান সিল্ক পাওয়া যায়। ইন্ডিয়ার সঙ্গে বাদগাস্টাইনের যোগ দেখছি ছিন্ন হওয়ার নয়।

পথের একপাশে চোখে পড়ল এক অতীব সুন্দর গির্জা। আমরা গির্জার ভিতরে ঢুকে দেখলাম ভারী সুন্দর গথিক স্থাপত্য। বার্লিনে এমিলিয়ে আর সুভাষ হিন্দু মতে বিবাহ করেছিলেন। বাদগাস্টাইনে আনুষ্ঠানিক কিছু হয়েছিল কি না জানা নেই। এই বিবাহের কথা গোপন রাখবেন বলে দু'জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। সেই প্রতিজ্ঞা এমন কঠোরভাবে পালন করেছিলেন যে, বহুকাল বাদে প্রকাশ করলেও আন্টি স্থান এবং তারিখ ছাড়া এ বিষয়ে আর কিছু বলেননি। গির্জা দেখে আমরা চার্চ ম্যারেজের কথা বলাবলি

করছিলাম। অধ্যাপক লিওনার্ড গর্ডন যখন নেতাজির জীবনী লিখছিলেন তখনই আন্টি তাঁকে বাদগাস্টাইনে বিবাহের কথা জানান। অধ্যাপক গর্ডন বাদগাস্টাইনে এসে এই গির্জাটি দেখে এখানকার কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ১৯৩৭ সালের কাগজপত্র তাঁদের কাছে আছে কি? তাঁরা বলেছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে তাঁদের সব রেকর্ড আছে, তার আগের কিছু নেই। অনিতা এবং আমরা অবশ্য এক বিশাল জলপ্রপাতের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, তাঁদের প্রিয় শহর বাদগাস্টাইনে এমিলিয়ে আর সুভাষ যে একসঙ্গে কয়েকটি আনন্দময় দিন কাটাতে পেরেছেন সেটাই সবচাইতে বড় কথা। আমরা অনুভব করতে পারছিলাম এখানকার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে এমিলিয়ে আর সুভাষের স্মৃতি।

এবার আমাদের এই স্মৃতি-বিজড়িত শহর ছেড়ে যাবার সময় হল। যাবার আগে আমরা বানহোফ অর্থাৎ এখানকার রেলস্টেশনে কিছু সময় কাটালাম। এই স্টেশনে ১৯৩৭ সালের নভেম্বরে সুভাষকে অভ্যর্থনা করেছিলেন এমিলিয়ে। এ ছাড়াও কতবার পরস্পরকে বিদায় জানিয়েছেন এই স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। আমাদের গাড়ি পাহাড়ি পথে নামতে শুরু করল। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। আমরা পিছনে ফেলে এলাম এমিলিয়ে আর সুভাষের যুগ্ম জীবনের নানা ঘটনার সাক্ষী পাহাড়ি শহর বাদগাস্টাইন।

আরও এক দীর্ঘ বিচ্ছেদ

সুভাষচন্দ্র ইউরোপ থেকে যখন দেশে ফিরলেন তখন তিনি জাতীয় কংগ্রেসের ভাবী সভাপতি। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিকে সেই সময়ে বলা হত রাষ্ট্রপতি। ইউরোপ থেকে ফিরবার পথে তিনি লন্ডনে থামলেন। লন্ডনে তাঁকে প্রবাসী ভারতীয়রা এবং অন্যান্য ভারতবন্ধুরা সাদর সংবর্ধনা জানালেন। লন্ডন থেকে এমিলিয়েকে তিনি জানালেন, তিনি যে বিমানে দেশে ফিরবেন সেই বিমান যাত্রাপথে ভিয়েনাতে অল্পক্ষণের জন্য দাঁড়াবে। এমিলিয়ে যেন অবশ্যই বিমানবন্দরে আসেন। দু'জনে আবার দেখা হবে। তিনি এমিলিয়েকে বললেন, উনি যেন দুটো ওমেগা হাতঘড়ি কিনে সঙ্গে আনেন। একটি ছেলেদের ঘড়ি আরেকটি মেয়েদের। বিশেষ করে বিমানবন্দরে আসার জন্য উনি টেলিগ্রামও করলেন। সেই সামান্য সময়ে বিমানবন্দরে সাক্ষাতের সময় মনে হয় দু'জনে দু'জনকে ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন। আগে তো কিছু উপহার দিয়ে উঠতে পারেননি। প্রায় দু' মাস বাদে সুভাষ এমিলিয়েকে আবার কিছু উপহার পাঠালেন। একজন বন্ধু লন্ডন যাচ্ছিলেন, তিনি নিয়ে যেতে রাজি হলেন। ১৯ এপ্রিল ১৯৩৮ সালে একটি চিঠিতে সুভাষ জানাচ্ছেন, তিনি এমিলিয়ের জন্য চারটি জিনিস পাঠাচ্ছেন। একটি হাতির দাঁতের নেকলেস, একজোড়া জুতো, একটি ব্রোচ আর হাতির দাঁত ও চন্দন কাঠের তৈরি একটি ছোট বাক্স।

এরপরের দুই বছর সুভাষচন্দ্রের খুবই ব্যস্ত এবং ঘটনাবহুল জীবন।

জানুয়ারির মাঝামাঝি উনি আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ফেব্রুয়ারি মাসে গুজরাতের হরিপুরাতে কংগ্রেসের বিরাট অধিবেশন। গাঁধী, নেহরু, পটেল, আজাদ সব কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ উপস্থিত। কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সুভাষচন্দ্রের হরিপুরা ভাষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যৎ ভারতের উন্নতির জন্য কী করা প্রয়োজন তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। ফেব্রুয়ারি ১৬ তারিখে ১৯৩৮ সাল এমিলিয়েকে লিখলেন, তোমাকে শুধু একলাইন লিখে জানাচ্ছি 'আমি এখন হরিপুরা কংগ্রেসে আছি, খুব ব্যস্ত আশাকরি তুমি ভাল আছ।' আরও নানান খবর জানাচ্ছেন, উনি ওয়ার্ধা গিয়েছিলেন গাঁধীজির সঙ্গে দেখা করতে। তারপর আবার বম্বে গেলেন জিন্নার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান নিয়ে আলোচনা করতে। মাঝে মাঝেই চিঠিপত্রের মধ্যে জার্মান ভাষায় নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। একটি চিঠিতে জার্মান ভাষায় যা লিখলেন তা বাংলায় অনুবাদ করলে অর্থ দাঁড়ায়, 'আমি রাত্রিদিন তোমার কথা চিন্তা করি।' অন্য আরেকটি চিঠিতে জার্মান ভাষায় লিখলেন, 'আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখো। তোমার চিঠি পড়লে আমার আনন্দ হয়, আমি অবশ্য প্রতি সপ্তাহে তোমাকে নিয়মিত চিঠি লিখতে পারছি না সেজন্য কিছু মনে কোরো না।'

সুভাষ চলে আসার পরেই আন্টির বাবা হঠাৎ মারা যান। সুভাষ খুব দুঃখ পেয়েছেন এবং আন্টির জন্য দুশ্চিন্তা করছেন। সুভাষের চিঠিপত্র থেকে আমরা বুঝতে পারছি আন্টিও তাঁকে নিয়মিত চিঠি লিখছেন। যদি জানতে পারা যেত আন্টি সেই সময়ে কী লিখছেন তা হলে বড় ভাল হত, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য সেই চিঠিগুলি ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে

গিয়েছে। আন্টিকে সুভাষ সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র গ্রাহক করে দিয়েছেন তা ছাড়া সচিত্র 'ওরিয়েন্ট' পত্রিকা পাঠাচ্ছেন। সুভাষের তাগিদে আর উৎসাহে আন্টি মাঝে মাঝে 'মর্ডান রিভিউ' পত্রিকার জন্য লেখা পাঠাচ্ছেন। একটি লেখা তো লিখেছেন বাদগাস্টাইন শহরের উপর। আন্টির সঙ্গে নানাভাবে ভারতের যোগ অক্ষুণ্ণ রয়েছে আর সুভাষ এমিলিয়ে তো হাজার হাজার মাইল দূরে থাকলেও সর্বদাই পরস্পরের চিন্তা ভাবনার মধ্যে রয়েছেন।

পরের বছর ১৯৩৯ সাল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে, বিশেষ করে কংগ্রেস রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগতভাবে সুভাষচন্দ্র নিজেও তাঁর রাজনৈতিক জীবনের এক পথসন্ধিতে দাঁড়ালেন। তিনি স্থির করলেন দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতির পদপ্রার্থী হবেন। মহাত্মা গাঁধী এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ছিলেন। কট্টরপন্থী কংগ্রেস নেতারা গাঁধীজির পিছনে দাঁড়ালেন। সুভাষচন্দ্র নির্বাচনে প্রার্থী হলেন। এই প্রথম প্রকৃত অর্থে কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচন হল। গাঁধীজির মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, গাঁধীজির মনোনীত প্রার্থী সীতারামাইয়াকে পরাস্ত করে সুভাষচন্দ্র জয়ী হলেন। এই জয় গাঁধীজির মনে তিক্ততা আর গাঁধীপন্থীদের মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি করল। ফলে রাজনীতিতে সৃষ্টি হল এক অভূতপূর্ব সংকট, 'বাপু' এবং তাঁর বিদ্রোহী পুত্র সুভাষের পথ আলাদা হয়ে গেল। কংগ্রেস নেতৃত্ব সুভাষের সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করেছিলেন। সুভাষ অত্যন্ত একাকী হয়ে পড়লেন। এই সংকটের সময়ে তাঁর পাশে দু'জন দাঁড়িয়েছিলেন। একজন তাঁর মেজদাদা শরৎচন্দ্র, অপরজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাইরের বিশ্ব জানত না তাঁর আরও একজন সমর্থক ছিলেন, তিনি হলেন তাঁর ভিয়েনাবাসিনী স্ত্রী এমিলিয়ে। তাঁর কাছে সুভাষ মনের কথা খুলে বলতে পারতেন।

সুভাষচন্দ্র যখন স্থির করলেন তিনি গাঁধীজির মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়াবেন, তখন তিনি এমিলিয়েকে চিঠি লিখলেন যে তিনি জিততে পারবেন বলে মনে হয় না। যখন উনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের ভোটে বেশ ভালভাবে জিতে গেলেন (১৫৮০-১৩৭৫) উনি এমিলিয়েকে জানালেন, 'আমি এক বছরের জন্য কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছি। মহাত্মা গাঁধী এবং তাঁর সেনাপতিরা আমার বিরোধিতা করেছিলেন আর পণ্ডিত নেহরু ছিলেন উদাসীন। এই নির্বাচনের ফল আমার পক্ষে এক বিপুল জয়।' উনি এমিলিয়েকে আরও জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার জয়ের খবরে তুমি আনন্দ করেছিলে তো?' এই চিঠিতে এমিলিয়েকে নির্বাচনের নানা নাটকীয় ঘটনার কথা লিখতে লিখতে হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন। উনি জানতে চাইলেন এমিলিয়ের জন্মের সঠিক মুহূর্ত কী এবং জন্মের সঠিক জায়গা কোথায়। উনি কি এমিলিয়ের কুষ্ঠি বানানোর কথা চিন্তা করছিলেন?

এই চিঠি লিখেছিলেন ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯, তারপরের চিঠির তারিখ ১৯ এপ্রিল, ১৯৩৯। ঘন ঘন চিঠিপত্রের মধ্যে দীর্ঘ দু'মাসের এক বিস্ময়কর নীরবতা। এই দীর্ঘ নীরবতার কারণ উনি পরে জানাচ্ছেন এবং মার্জনা চেয়ে নিচ্ছেন। উনি খুব সংকটজনকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। মধ্যপ্রদেশের ত্রিপুরিতে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে ওঁর সভাপতিত্ব করার কথা। এমন সময় উনি নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হলেন, প্রচণ্ড জ্বর। ডাক্তারেরা পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বললেন কিন্তু উনি অধিবেশনে যোগ দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসু এবং আর এক ভাই প্রখ্যাত ডাক্তার সুনীলচন্দ্র বসু সুভাষের সঙ্গে গেলেন। কংগ্রেস সভাপতিকে স্ট্রেচারে

করে অধিবেশন স্থলে নিয়ে যেতে হল। সভাপতি তাঁর ভাষণ নিজে পড়তে পারলেন না। মেজদাদা শরৎচন্দ্র তাঁর হয়ে ভাষণটি পড়ে দিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কংগ্রেসের ত্রিপুরি অধিবেশন একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। কংগ্রেসের গাঁধীপন্থী নেতারা কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতির বিরুদ্ধে এক অকথ্য ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অপপ্রচার চালিয়েছিলেন। সেসময়ে সভাপতি সুভাষচন্দ্র আবার গুরুতর অসুস্থ। গাঁধীজির চেলাচামুণ্ডারা এমন অপবাদও রটিয়ে দিলেন যে সুভাষচন্দ্র আসলে অসুস্থ নন, অসুস্থ হবার ভান করছেন মাত্র।

এই অধিবেশনের পর সুভাষ বিহারের জামাডোবাতে (এখন ঝাড়খণ্ডে) তাঁর আর এক ভাই সুধীরচন্দ্র বসুর গৃহে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ছিলেন। সেখান থেকে আন্টিকে লিখলেন, 'আমার খুব বাদগাস্টাইনে গিয়ে শরীর সারিয়ে আসতে ইচ্ছা করছে।'

তিনি কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগের খবর আন্টিকে দিয়েছিলেন। উনি লিখেছিলেন, 'তুমি হয়তো এতদিনে শুনেছ যে আমি কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেছি কারণ মহাত্মা গাঁধী এবং তাঁর গোঁড়া অনুচরদের সঙ্গে কোনও মতৈক্যে আসা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।' জামাডোবাতে নেহরু গিয়ে সুভাষের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং উভয়পক্ষে একটা মিটমাটের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সফল হননি। রবীন্দ্রনাথের একান্ত ইচ্ছা ছিল সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার সভাপতি থাকবেন। তিনি তাঁকে পদত্যাগ করতে নিষেধও করেছিলেন। এই দুর্ভাগ্যজনক রাজনৈতিক সংঘাতের সময়ে সুভাষচন্দ্র যে মানসিক স্থৈর্য্য এবং সংযম দেখিয়েছিলেন তার জন্য রবীন্দ্রনাথ সুভাষকে অভিনন্দিত করেছিলেন। কবি বলেছিলেন, তোমার আপাত পরাজয় একদিন চিরদিনের জয়ে পরিণত হবে।

সুভাষচন্দ্র এমিলিয়েকে লিখলেন, 'আমি পদত্যাগ করে কিছু হারাইনি বরং প্রকৃতপক্ষে আমি আরও বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছি।' পদত্যাগের পর উনি যখন লাহোরে গেলেন, লাহোর রেলস্টেশনে এক বিশাল, উচ্ছ্বসিত জনতা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল যুবক এবং ছাত্র— অবশ্য ভিড়ের মধ্যে সুভাষের পকেটমার হয়ে গিয়েছিল এবং আন্টির একটি চিঠি আর একটি ছবি উনি হারিয়েছিলেন।

আগস্ট ১৯৩৯, সুভাষ ঠিক করে ফেলেছিলেন তিনি বাদগাস্টাইনে যাবেন আর আন্টির সঙ্গে কিছুদিন কাটাবেন, কিন্তু উনি এত কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে বাদগাস্টাইন যাওয়া সম্ভব হল না। তারপর সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ফলে এমিলিয়ে ও সুভাষের সে সময়ে দেখা তো হলই না, তাঁদের একমাত্র যোগসূত্র ছিল চিঠিপত্রের আদান-প্রদান, মহাযুদ্ধের কারণে তাও বন্ধ হয়ে গেল।

মহাযুদ্ধের মধ্যে পুনর্মিলন

আন্টি নিশ্চয় খুবই চমকে গিয়েছিলেন যখন দীর্ঘ কুড়ি মাস পরে উনি সুভাষের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলেন। সুভাষ জানাচ্ছেন তিনি মহাযুদ্ধের মধ্যে ইউরোপে এসে পৌঁছেছেন। সুভাষ বার্লিনে পৌঁছলেন ২ এপ্রিল ১৯৪১ সালে। তারপর দিন অর্থাৎ এপ্রিলের ৩ তারিখে উনি এমিলিয়েকে ভিয়েনাতে লিখলেন, 'তুমি আমার কাছ থেকে এই চিঠি পেয়ে খুব অবাক হয়ে যাবে, তুমি আরও বেশি অবাক হবে জেনে যে আমি বার্লিন থেকে এই চিঠি লিখছি।' সুভাষ এমিলিয়েকে জানালেন যে উনি এখানে অরল্যান্ডো মাৎসোটা এই ছদ্মনামে রয়েছেন। ওঁকে চিঠিপত্র লিখলে ওই নামে লিখতে হবে। উনি খুব তাড়াতাড়ি জানাতে বললেন এমিলিয়ে কি ভিয়েনা থেকে বার্লিনে আসতে পারবেন আর ওঁর সেক্রেটারির কাজ করতে পারবেন।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ত্বরান্বিত করার এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। শত্রুপক্ষ অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন বিপদে তখনই তো আঘাত হানতে হয়। নেতাজি গাঁধীজিকে বললেন, এই মুহূর্তে এক সর্বভারতীয় আন্দোলন শুরু করা উচিত। কিন্তু গাঁধীজি জবাবে বললেন, এখনও আন্দোলনের সময় হয়নি। অবশ্য গাঁধীজি ধীরে ধীরে তাঁর মত বদল করেছিলেন এবং

শেষ পর্যন্ত ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিলেন। সুভাষচন্দ্র ভেবে দেখলেন যে, দেশে থাকলে জেলে বন্দি হয়ে সময় নষ্ট করতে হবে, তার চাইতে উনি দেশের বাইরে যাবার চেষ্টা করবেন এবং বিদেশ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করবেন। নেতাজির লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মি। ইংরেজরা এই ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মি দিয়ে ভারত শাসন করত এবং অন্যান্য ব্রিটিশ কলোনিগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখত। এই ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির সৈনিকদের আনুগত্য ছিল ব্রিটিশ রাজশক্তির উপর। নেতাজি বুঝতে পেরেছিলেন এই আনুগত্য ভাঙতে হবে আর ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে দেশপ্রেমের গর্ব জাগ্রত করতে হবে। এক দেশপ্রেমিক ভারতীয় জাতীয় বাহিনী স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে পারবে। বার্লিনে পৌঁছে নেতাজি একটি 'ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার' গড়ে তুললেন। উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে যেসব ভারতীয় সৈনিক যুদ্ধবন্দি হয়েছিলেন তাদের নিয়ে তিনি কাজ শুরু করলেন। যুদ্ধের সময় জার্মানিতে অনেক ভারতীয় ছাত্র আটকে পড়েছিলেন। নেতাজি এইসব ছাত্রদের এবং জার্মানিতে উপস্থিত অন্যান্য ভারতীয় নাগরিকদেরও ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টারে যুক্ত করলেন।

ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টারে কর্মীদের ও ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের জার্মান সামরিক অফিসাররা মিলিটারি ট্রেনিং দিতে লাগলেন। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন ওয়ালটার হার্বিশ নামে এক দক্ষ জার্মান অফিসার। আমার মনে আছে ১৯৮১ সালে যখন শিশির আর আমি অনিতার কাছে আউগসবার্গে ছিলাম, আমরা ওয়ালটার হার্বিশের সঙ্গে মিউনিখে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আউগসবার্গ থেকে ঘণ্টাখানেকের দূরত্বে মিউনিখ শহরের একটি ফ্ল্যাটে হার্বিশ থাকতেন। এই সাক্ষাৎকারের সময় আমাদের বালক

পুত্র সুমন্ত্র সঙ্গে ছিল। তার তখন বয়স ১২ বছর হবে। তখন ওয়ালটার হার্বিশের বেশ বয়স হয়েছে, কিন্তু তখনও তাঁকে দেখলেই বোঝা যেত এক চটপটে মিলিটারি অফিসার।

নেতাজির খুব সৌভাগ্য যে জার্মান ফরেইন অফিসে ইন্ডিয়া ডেস্কে যাঁরা কাজ করতেন তাঁরা সকলেই ছিলেন সুশিক্ষিত এবং আন্তরিক, যেমন অ্যাডাম ফন ট্রট এবং আলেকজান্ডার ওয়ার্থ। এঁরা দু'জনেই ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ১৯৪৪ সালে অ্যাডাম ফন ট্রট হিটলারকে হত্যা করার এক ষড়যন্ত্র করেছিলেন কিন্তু ব্যর্থ হন। ধরা পড়ে যাওয়াতে ফন ট্রটের মৃত্যুদণ্ড হয়। আলেকজান্ডার ওয়ার্থ বেঁচে যান। ওয়ার্থের সঙ্গে আমার এবং শিশিরকুমার বসুর গভীর হৃদ্যতা হয়। ১৯৭০ সালের গোড়াতে নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগ দিতে আলেকজান্ডার ওয়ার্থ কলকাতায় নেতাজি ভবনে আসেন। ওয়ার্থের মৃত্যুর পর ওয়ার্থের স্ত্রী হেলগে ওয়ার্থ আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। ১৯৮৯ সালের গ্রীষ্মকালে সুইজারল্যান্ডের সেন্ট মরিৎস শহরের কাছে সিলস মারিয়া নামে এক অপূর্ব সুন্দর পাহাড়ি শহরে হেলগে ওয়ার্থের সঙ্গে আমি, শিশির এবং আমাদের তিন ছেলে-মেয়ে এক আনন্দময় পারিবারিক ছুটি কাটাই।

এপ্রিল ১৯৪১, সুভাষের আহ্বান পেয়ে এমিলিয়ে ভিয়েনা থেকে বার্লিন এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। এরপরে বছর দেড়েক সুভাষ আর এমিলিয়ে তাঁদের সোফিয়েনস্ট্রাসের বাড়িতে তাঁদের স্বল্পকালীন সংসারজীবন কাটাতে পেরেছিলেন। সুভাষ আর এমিলিয়ের এই দিনগুলি কেমন কেটেছিল জানতে বেশ ইচ্ছা হত। কিন্তু আন্টি খুব চাপা স্বভাবের

ছিলেন। সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলে ওঁর কাছ থেকে বিশেষ খবর আদায় করা যেত না। কিন্তু নানারকম অন্য কথাবার্তার মধ্যে আন্টি মাঝে মাঝে সেসব দিনের কথা দু'-একটা বলে ফেলতেন। একবার বললেন, 'তোমাদের আঙ্কল খুব ওষুধপত্র খেতে ভালবাসতেন। সবচেয়ে বিরক্তিকর হল নিজে তো ওষুধ খাবেনই, আবার আমাকে নানারকম ওষুধ খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতেন। একবার তো আমাকে জোর করে কী যেন একটা আয়ুর্বেদিক ওষুধ খাইয়ে তবে ছাড়লেন।' আন্টি অনেক কষ্টে ওষুধটির নাম উচ্চারণ করে বললেন, 'ম-ক-র-ধ্ব-জ'। সোফিয়েনস্ট্রাসের বাড়িতে ওঁরা দু'জন অতিথি আপ্যায়ন করতেন, ডিনার খাওয়াতেন। অনেক উচ্চপদস্থ অফিসাররা বাড়িতে আসতেন। আমার কেমন যেন মনে হত আন্টি অ্যাডাম ফন ট্রট আর তাঁর স্ত্রী ক্ল্যারিটাকে খুব পছন্দ করতেন না। আমি আশ্চর্য হতাম, কারণ ফন ট্রটরা নেতাজির সত্যিকারের বন্ধু ছিলেন আর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ছিল তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন। আন্টির মনে হত ফন ট্রটরা খুব অভিজাত পরিবারের মানুষ। আন্টি এসেছেন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। আন্টির ধারণা ছিল ওঁরা তাঁকে একটু কৃপার চোখে দেখেন। আন্টির এই ধারণা সত্য নাও হতে পারে, কিন্তু উনি এরকম একটা সন্দেহে ভুগতেন। বার্লিনের ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টারে তখন খুব কাজকর্ম চলত। অফিসটা ছিল লিখটেনস্টাইন আলেতে। যেসব ভারতীয়েরা ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টারে কর্মরত ছিলেন তাঁদের সকলেরই সোফিয়েনস্ট্রাসের বাড়িতে ছিল অবাধ যাতায়াত। এঁদের মধ্যে ছিলেন নাম্বিয়ার, আবিদ হাসান, এন জি স্বামী, গিরিজা মুখার্জি আর এম আর ব্যাস। আন্টি নিজেও এঁদের সঙ্গে ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টারে কাজ করতেন। অনিতার জন্মের কিছুদিন আগে উনি ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টারের কাজ

থেকে ছুটি নিলেন। ১৯৪২ সালের শেষের দিকে আন্টি ওঁর মায়ের সঙ্গে ভিয়েনাতে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। এই সময়ে দু'জনের মধ্যে তেমন চিঠিপত্র নেই, ফোনে কথাবার্তা হচ্ছে মাঝে মাঝে, ছোটখাটো নোট বিনিময়ও হচ্ছে। সুভাষ ওঁর জন্য উদ্বিগ্ন আছেন। যুদ্ধের মধ্যে খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট, সুভাষ মাঝে মাঝে ভিয়েনাতে ফুড কুপন পাঠাচ্ছেন, কখনও বা তাজা ফলমূল। টেলিফোনে ইংরেজিতে কথাবার্তা বলার ওপর কিছু একটা বিধিনিষেধ ছিল, তবে সেই জটিলতা কেটে গিয়েছিল। সুভাষ ততদিনে সংসার জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন আন্টির অনুপস্থিতিতে। ওঁর অসুবিধে হচ্ছে বিশেষ করে একটা বই খুঁজে পাচ্ছেন না, দরকারি টেলিফোন নম্বর কোথায় আছে পাচ্ছেন না, বাড়িতে অতিথিকে খেতে বলেছেন, তার জন্য বিশেষ একটা ওয়াইন কোথায় পাবেন জানেন না।

ইতিমধ্যে ১৯৪১-এর শেষদিক থেকে বিশ্বযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি পালটে গিয়েছে। যুদ্ধের থিয়েটার এখন এশিয়াতে। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভেদ্য দুর্গ বলে খ্যাত সিঙ্গাপুরের জাপানের হাতে পতন হয়েছে। নেতাজি সুভাষ এশিয়াতে গিয়ে ভারতের মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য ছটফট করছেন, কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে ইউরোপ থেকে এশিয়া যাওয়া বলতে গেলে অসম্ভব। একবার রোম থেকে একটা এরোপ্লেনে এশিয়া যাবার গোপন পরিকল্পনা করা হয়েছিল, কিন্তু অক্টোবর ১৯৪২-এ এই গোপন যাত্রার কথা রোম থেকে ফাঁস হয়ে যায় ফলে এই পরিকল্পনার কথা তৎক্ষণাৎ বাতিল করতে হয়। এক হিসেবে এটা খুব ভাল হল, যদি উনি অক্টোবরে চলে যেতেন তা হলে কন্যা অনিতার জন্ম দেখে যেতে পারতেন না। অনিতার জন্ম হল ভিয়েনাতে ২৯ নভেম্বর ১৯৪২ সালে। সুভাষ আর এমিলিয়ে তাঁদের মেয়ের নামকরণ করলেন

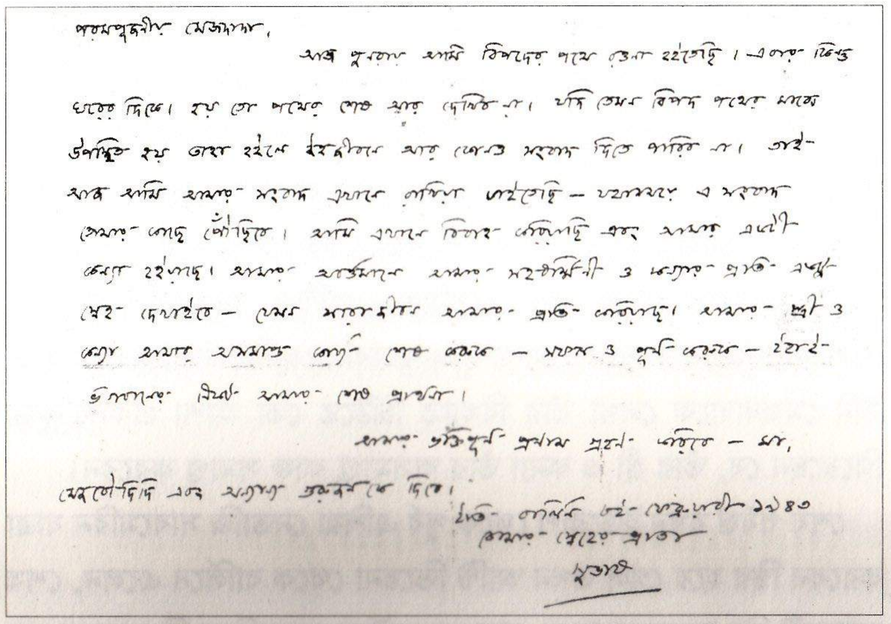

ইউরোপ থেকে এশিয়ায় সাবমেরিন যাত্রার প্রাক্কালে শিশিরকে এমিলিয়ে ও অনিতার কথা জানিয়ে সুভাষের চিঠি (বাংলায়), ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩।

অনিতা। ইটালির স্বাধীনতা যোদ্ধা গ্যারিবল্ডির স্ত্রীর নাম ছিল অনিতা। তিনি ছিলেন ব্রাজিলের মেয়ে, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে ইটালির স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁকেই শ্রদ্ধা জানিয়ে সুভাষ আর এমিলিয়ে তাঁদের কন্যার নাম রাখলেন অনিতা।

ডিসেম্বর মাসে নেতাজি তাঁর সদ্যোজাত কন্যাকে দেখতে ভিয়েনা গেলেন। আমার সঙ্গে নাম্বিয়ারের দেখা হয়েছিল জুরিখে ১৯৭১ সালে। সেই সময় আমাকে উনি নেতাজির সঙ্গে ইউরোপে কাটানো দিনগুলি সম্পর্কে অনেক অনেক কথা বলেছিলেন। উনি আমাকে বলেন নেতাজির সঙ্গে উনি ভিয়েনাতে গিয়েছিলেন আর বেবি অনিতাকে নেতাজির উপস্থিতিতেই দেখেন। নেতাজি পিতা হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

আন্টি আমাকে একবার বলেছিলেন, তোমাদের আঙ্কল যেন মনে মনে পুত্র-সন্তান আশা করেছিলেন। শুনে তো আমি বিস্ময়ে হতবাক। নেতাজির মতো নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তির এমন কথা মনে হতেই পারে না। লক্ষ্মী (সাহগাল) আর আমি কত সময়ে বলাবলি করেছি, নেতাজির মতো ফেমিনিস্ট বড় একটা দেখা যায় না। হয়তো আন্টির এরকম মনের ভুল হয়েছিল। আন্টিও আমাদের বলেছেন শিশুকন্যাকে দেখে সুভাষ আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া উনি মেজদাদাকে লেখা তাঁর বিখ্যাত চিঠিতে তো আশা প্রকাশ করে গিয়েছেন যে, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবেন।

শেষ পর্যন্ত যখন ইউরোপ থেকে পূর্ব এশিয়া নেতাজি সাবমেরিন যাত্রা করবেন স্থির হয়ে গেল তখন আন্টি ভিয়েনা থেকে বার্লিনে এলেন, শেষ কয়েকটি দিন সুভাষের সঙ্গে একসঙ্গে কাটালেন। অনিতা ভিয়েনাতে ওর দিদিমার কাছে রইল। তিনি ওর দেখাশোনা করতে লাগলেন। নেতাজি বার্লিন ছেড়ে যাওয়ার আগে আন্টিকে বললেন, আন্টি যেন আরও কয়েকদিন সোফিয়েনস্ট্রাসের বাড়িতে থেকে যান। সন্ধ্যার পর বাড়ির ঘরে ঘরে যেন আলো জ্বালানো থাকে। বাইরে থেকে দেখে যেন মনে হয় সবকিছু স্বাভাবিক আছে। শূন্য বাড়িতে সেই দিনগুলি কাটাতে আন্টির মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি।

জার্মানি ছেড়ে যাবার আগে নেতাজি সুভাষচন্দ্র শরৎচন্দ্র বসুর কাছে একটি চিঠি লিখে সেটি এমিলিয়ের কাছে রেখে যান। সুভাষের প্রিয় মেজদাদা, যিনি সারাজীবন সব কাজে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁকে বাংলায় লেখা এই চিঠিটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। সুভাষ মেজদাদাকে লিখলেন, তিনি আবার এক বিপদের পথে যাত্রা করছেন, পথের শেষ দেখবেন কি

না জানেন না। এ জীবনে দু'জনে আর দেখা হবে কি না তাও অজানা। যদি আর কোনও খবর এ জীবনে দিতে না পারেন তাই তিনি কিছু খবর আজ রেখে যাচ্ছেন।'

তিনি জানালেন যে তিনি এখানে বিবাহ করেছেন এবং তাঁর একটি কন্যাসন্তান হয়েছে। তিনি মেজদাদার কাছে প্রার্থনা করলেন তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে যেন তিনি স্নেহ করেন যেমন সারাজীবন তাঁকে করেছেন। এই চিঠিতেই আশা ব্যক্ত করেন যে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর ব্রিটিশ সরকার বসুবাড়ির সদস্যদের, যাঁরা জেলে ছিলেন, তাঁদের মুক্তি দেয়। সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ শরৎচন্দ্র বসু মুক্তি পেলেন। তার আগে তিনি নীলগিরি পাহাড়ের কুনুরে বন্দিজীবন কাটাচ্ছিলেন। মুক্তি পাবার কিছুকাল পরে (আগস্ট ১৯৪৬) তিনি এমিলিয়ের কাছ থেকে একটি চিঠি পান। এমিলিয়ে তাঁকে সুভাষের সঙ্গে তাঁর বিবাহের খবর এবং অনিতার কথা জানান। যুদ্ধের পর তখনও চিঠিপত্র চলাচল খুব স্বাভাবিক হয়নি। এমিলিয়ে জানান সুভাষচন্দ্র যে চিঠিটি মেজদাদাকে লিখে রেখে গেছেন চিঠিপত্র চলাচল আর একটু স্বাভাবিক হলে তিনি সেটি পাঠাবেন। উডবার্ন পার্কের বাড়িতে পরিবারের মধ্যে আন্টির চিঠির প্রথম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল পরম বিস্ময়। শরৎচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র অশোক পড়াশুনার কারণে ত্রিশের দশকে অনেকদিন জার্মানিতে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে এমিলিয়ের আলাপ পরিচয় ছিল। আরেক পুত্র অমিয় ১৯৩৭ সালের শীতকালে বাদগাস্টাইনে সুভাষের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। এঁরা দু'জনের কেউ সুভাষ ও এমিলিয়ের সম্পর্কের গভীরতা বুঝতে পারেননি। তাঁরা এমিলিয়েকে তাঁদের কাকাবাবুর একজন খুব ভাল বন্ধু হিসেবে চিনতেন। ১৯৪৮ সালের শীতকালে শরৎচন্দ্র বসু ঠিক করলেন তিনি ইউরোপে যাবেন। স্ত্রী বিভাবতী এবং তিন ছেলে

মেয়ে শিশির, রমা আর চিত্রাকে নিয়ে ইউরোপে বিমানযাত্রা করলেন। শরৎচন্দ্র ঠিক করেছিলেন পুত্র শিশিরকে উচ্চতর মেডিকেল শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে পড়াশুনোর ব্যবস্থা করবেন। সারা ইউরোপ ভ্রমণের পর ওঁরা লন্ডনে এলেন আর শিশিরকে লন্ডনের গ্রেট আরমন্ড স্ট্রিটের শিশু হাসপাতালে শিশু-চিকিৎসার উচ্চতর পাঠের জন্য ভরতি করলেন। তার আগে উনি সপরিবার ভিয়েনা শহর ইউরোপের অন্যান্য অনেক বড় শহর সফর করলেন।

যখন বম্বে থেকে শরৎচন্দ্র ও তাঁর পরিবার রোমে যাবার জন্য বিমানে উঠলেন, তাঁরা সেই বিমানে একজন পরিচিত মুখ দেখে বেশ আশ্চর্য হলেন। ইনি হলেন এন জি স্বামী। স্বামী নেতাজির সহযোগী হিসেবে জার্মানিতে ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টারে কাজ করেছেন। তারপর নেতাজির পিছনে পিছনে আর একটি সাবমেরিনে করে পূর্ব-এশিয়াতে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি আইএনএ-র ইন্টেলিজেন্সে প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। স্বাধীন ভারতে স্বামী নেহরু সরকারের জন্য কাজ করতে থাকেন। শিশির আমাকে বলেছিলেন যে, স্বামীকে এরোপ্লেনে দেখে বাবা শরৎচন্দ্র খুবই সন্দেহ প্রকাশ করেন। বাবা বলেন এটা কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। ভারত সরকার শরৎচন্দ্র বসু ইউরোপে কোথায় যাচ্ছেন জানবার জন্য স্বামীকে ওঁদের পিছনে লাগিয়েছে। যখন ২০১৫ সালে কিছু নেতাজির ফাইল প্রকাশিত হল এবং দেখা গেল শিশিরসহ বসু পরিবারের সদস্যদের ওপর স্বাধীন ভারত সরকার নজরদারি চালাতেন, (যা ১৯৭০ সাল পর্যন্ত চলেছিল) তখন আমার স্বামীর ঘটনাটা মনে পড়ে গেল।

বাবা শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণের সময়ে আরও একটি বিশেষ ঘটনা শিশির আমাকে বলেছিলেন। সেটি হল তাঁরা যখন

চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ্ শহরে রয়েছেন, তখন শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে ভারতীয় সাংবাদিক হারীন শাহর সাক্ষাৎকার। এই ঘটনাটির কথা শিশির তাঁর বাংলা স্মৃতিকথা 'বসুবাড়ি' (১৯৮৫ সালে প্রকাশিত) এবং ইংরেজি স্মৃতিকথা 'The Bose Brothers, An Intimate Memoir' (২০১৬ সালে প্রকাশিত) এই দুটি বইতেই লিপিবদ্ধ করেছেন। হারীন শাহ শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে দেখা করতে প্রাগের হোটেলে এসেছিলেন। শরৎচন্দ্র পুত্র শিশিরকুমারকে বলেছিলেন এই সাক্ষাৎকারের সময় তিনি যেন উপস্থিত থাকেন। শিশির উপস্থিত ছিলেন। হারীন শাহ ওঁদের বলেন ১৯৪৬ সালে তিনি তাইপে গিয়েছিলেন। যে বিমান দুর্ঘটনায় ১৮ আগস্ট ১৯৪৫ সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছিল বলে জানা গিয়েছিল, তিনি তাইপেতে সেই ঘটনা সম্পর্কে নানারকম খোঁজখবর করেন। যে হাসপাতালে বিমান দুর্ঘটনায় আহতদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তিনি সেই হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। সেখানে অনেকের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়, তাঁদের মধ্যে একজন নার্স ছিলেন যিনি বলেন তিনি গুরুতর আহত সুভাষচন্দ্রকে সেবা করেছিলেন। হারীন শাহ বলেন, তিনি ক্রিমেটোরিয়ামও পরিদর্শনে যান, যেখানে গ্যাস চুল্লিতে তাঁকে দাহ করা হয়েছিল। ক্রিমেটোরিয়ামের একজন কর্মী জানায় যে তাকে বলা হয়েছিল, তুমি যাঁকে সৎকার করলে তিনি ভারতের একজন মস্ত বড় নেতা। দেশে ফিরে এসে সাংবাদিক হারীন শাহ তাঁর পুরো অভিজ্ঞতার কথা সর্দার বল্লভভাই পটেলকে জানান। সর্দার পটেল তাঁকে বলেন তিনি যেন শরৎচন্দ্র বসুকে সব কথা জানান ও এ-বিষয়ে কথা বলেন। হারীন শাহ এখন ইউরোপে থাকেন। তিনি খবর পেয়েছেন যে শরৎচন্দ্র বসু প্রাগে এসেছেন, তাই তিনি এই সুযোগে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন।

পরবর্তীকালে হারীন শাহ তাঁর এই তাইপে যাত্রা নিয়ে একটি বই লেখেন। বইটির নাম 'The Gallant End of Netaji'। এই বইটি ১৯৫৬ সালে উডবার্ন পার্কে দৈবাৎ আমার হাতে আসে আর আমি বইটি পড়ে ফেলি। বইটি পড়ার পর আমার মন এক গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আমি কয়েকদিন খেতে পারছিলাম না, কোনও কাজে মন দিতে পারছিলাম না। সেই সময়ে শিশিরকুমার বসু আমাকে বলেন, 'তোমার বই পড়েই এই দশা! তা হলে আমরা যখন প্রাগে সামনাসামনি বসে এই কাহিনি শুনেছিলাম তখন আমাদের মনের অবস্থা কী হয়েছিল তা ভেবে দেখো।' শিশির আমাকে আরও বলেন, 'হারীন শাহ যখন বিমান দুর্ঘটনা এবং তার পরের সব খুঁটিনাটি বর্ণনা করছিলেন তখন বাবার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে আমি বাবার জন্য উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। বাবার মুখ একেবারে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিল। হারীন শাহ চলে যাওয়া মাত্র আমি বাবাকে বললাম এসব কথা একদম বিশ্বাস করবেন না। জোর গলায় কথাটা বললাম বটে, কিন্তু লোকটির বিশদ এবং সজীব বর্ণনা আমাদের দু'জনকেই একান্ত বিচলিত করেছিল।'

ওঁদের এই পারিবারিক ভ্রমণ ইটালি ও সুইজারল্যান্ডের নানা শহরে এবং ডাবলিন, প্যারিস এবং লন্ডনে নিয়ে গিয়েছিল। যেখানেই যেতেন শরৎচন্দ্র বসুর জননেতা হিসেবে খুব ব্যস্ত সফরসূচি থাকত। তারই মধ্যে একটু ঘুরে বেড়ানোও হত। শিশিরের এই প্রথম ইউরোপ যাত্রা তিনি খুবই উপভোগ করেছিলেন। শিশির অনেক ফোটোগ্রাফও তুলেছিলেন তবে এই ভ্রমণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ভিয়েনা শহর, কারণ সেখানে আছেন সুভাষের স্ত্রী ও কন্যা এমিলিয়ে ও অনিতা।

শিশিরের বোন এবং আমার ননদ রমা আমাকে বলেছিলেন যে,

সুভাষের বিবাহের কথাটা বাড়ির ছোট তিন ছেলেমেয়ে রমা, চিত্রা ও সুব্রতকে আগে বলা হয়নি। যদিও উডবার্ন পার্কের বাড়িতে এ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে এবং ওদের বড় দাদা-দিদিরা ও শিশির সব কথাই জানতেন। রমা বলেন যে প্রাগ থেকে ভিয়েনা রওনা হবার আগে শরৎচন্দ্র বসু তাঁর দুই কন্যা রমা ও চিত্রাকে হোটেলে তাঁর নিজের ঘরে ডেকে পাঠান। তারপর খুব সহজভাবে বলেন, 'তোমাদের রাঙাকাকাবাবু (সুভাষ) বিয়ে করেছিলেন, আমরা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।' রমার বেশ মনে পড়ে যে, বাবা আমরা চলতি বাংলায় যেভাবে 'বিয়ে' কথাটা উচ্চারণ করি ঠিক সেইভাবে বলেছিলেন, তোমাদের রাঙাকাকাবাবু 'বে' করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের প্রিয় মেজদাদার পরিবারের সঙ্গে ভিয়েনাতে আন্টির প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা আমি কতবার যে শুনেছি কী বলব। কখনও আন্টির নিজের মুখেই প্রথম দেখা হওয়ার গল্প শুনেছি, কখনও বা শিশিরের কাছে শুনেছি, ওঁর ছোট দুই বোন রমা ও চিত্রাও এই দেখা হওয়ার কথা বলেছে। এই প্রথম সাক্ষাতের কথা শিশির তাঁর বাংলা 'বসুবাড়ি' (১৯৮৫ সালে প্রকাশিত) বইতে এবং ইংরেজি 'Subhas and Sarat, An Intimate Memoir of The Bose Brothers' (২০১৬ সালে প্রকাশিত) গ্রন্থে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। আমি যেবার প্রথম ১৯৫৯-এর শীতকালে ভিয়েনাতে যাই, আন্টির সঙ্গে প্রথম সন্ধ্যাতেই যখন রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে গল্প করছি, আন্টি তাঁর দু'হাতে কয়েকগাছা সোনার চুড়ি দেখিয়ে বললেন, 'তোমার শাশুড়ি এই চুড়ি আমাকে দিয়েছিলেন, নভেম্বর ১৯৪৮-এ প্রথম যেদিন দেখা হয় উনি আমার হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন। আমি কোনওদিন হাত থেকে এই চুড়ি খুলিনি।' আমি শুনেছি যে বিভাবতী নিজের হাত

থেকে খুলেই এই চুড়ি আন্টিকে পরিয়ে দেন। সঙ্গে দিয়েছিলেন একটি সাদা বেনারসি শাড়ি। আন্টির সঙ্গে পরিবারের প্রথম দেখা হয়েছিল ভিয়েনার বিমানবন্দরে। আমি খুব মর্মস্পর্শী বর্ণনা সকলের কাছে শুনেছি। শরৎচন্দ্র বিমান থেকে নেমে এলে পর আন্টি ওঁর দিকে চেয়ে বলে উঠেছিলেন, 'Just like him' একেবারে ওঁর (সুভাষের) মতো দেখতে। সুভাষচন্দ্রের মেজদাদাকে লেখা মূল চিঠিটা তিনি ওঁর হাতে তুলে দেন। মেজদাদা সেটি গ্রহণ করে নীরবে পকেটে রেখে দেন।

ছোট্ট অনিতার সঙ্গে পরিবারের দেখা হল আন্টির ফ্ল্যাটে। শরৎচন্দ্র, বিভাবতী, শিশির আর তার দুই বোন অনিতাকে দেখে রোমাঞ্চিত। আপনজনেরা আসবে জেনে অনিতাও খুব উত্তেজিত হয়েছিল। সে তখন শুধু জার্মান ভাষায় কথা বলত আর ক্রমাগত বকবক করে যেত। পরিবারের সকলে ভিয়েনাতে থাকার সময়ে অনিতার ছয় বছরের জন্মদিন হল। সেই জন্মদিনে অর্থাৎ ২৯ নভেম্বর ১৯৪৮ সালে একটি সুন্দর পারিবারিক ছবি নেওয়া হয়েছিল। ছবির কেন্দ্রে শিশিরের কোলে অনিতা বসে আছে, তার দু'পাশে বসে আছেন জ্যাঠামশাই শরৎচন্দ্র আর জ্যাঠাইমা বিভাবতী। পিছনের সারিতে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন আন্টি এমিলিয়ে আর তাঁর দুইপাশে রমা ও চিত্রা। এই ছবিটি খুবই সুপরিচিত। এই ভিয়েনা যাত্রার সময় থেকে শরৎচন্দ্র বসুর পরিবারের সঙ্গে আন্টির এক অচ্ছেদ্য বন্ধনের সৃষ্টি হয়। জানুয়ারি ১৯৪৯ সালে শরৎচন্দ্র ও বিভাবতী পুত্র শিশিরকে ডাক্তারি পড়াশুনোর জন্য লন্ডনে রেখে দুই কন্যাকে নিয়ে দেশে ফিরে আসেন।

আমি কিছুতেই ভেবে পাই না, কেন দেশে প্রত্যাবর্তনের পর শরৎচন্দ্র বসু সুভাষ ও এমিলিয়ের বিবাহের কথা এবং ওঁদের সঙ্গে এমিলিয়ে ও

অনিতার সাক্ষাতের কথা জানিয়ে একটি প্রকাশ্য আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করলেন না। এতদিনে তো বৃহত্তর বসু পরিবারের সকলেই এই খবর জেনে গেছেন। ভারত সরকারও এর আগেই নেতাজির স্ত্রী ও কন্যা আছেন এই খবর তাদের গোয়েন্দা দপ্তরের সূত্রে জেনে গিয়েছিলেন। অতএব এখন গোপনীয়তার কী প্রয়োজন। শিশিরকে একথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'বাবা একেবারে মনস্থির করে ফেলেছিলেন আন্টি আর অনিতাকে বরাবরের মতো ভারতে নিয়ে আসবেন, কিন্তু তার ব্যবস্থাপনা করার জন্য একটু সময়ের প্রয়োজন ছিল। বাবা জানতেন আন্টি পাশ্চাত্যের মেয়ে। তিনি অনির্দিষ্টকালের জন্য কোনও যৌথ পরিবারে বসবাস করবেন এমন আশা করা যায় না। তাই আন্টি ও অনিতার থাকার জন্য কিছু নির্দিষ্ট বন্দোবস্ত করতে হবে। কিন্তু কিছু করে ওঠার আগেই অকস্মাৎ বাবার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ল। তিনি তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে উঠতে সময় পেলেন না।' নেতাজি ফাইল সরকার প্রকাশ করার পর সর্দার পটেল ও শরৎচন্দ্র বসুর একটি পত্রালাপ প্রকাশ্যে এসেছিল। এই চিঠিপত্র শরৎচন্দ্র বসু ভিয়েনা যাবার অনেক আগেই লেখা (১৯৪৬ সাল)। সর্দার পটেল শরৎচন্দ্র বসুকে জানাচ্ছেন, তাঁর কাছে খবর এসেছে যে ভিয়েনাতে সুভাষের স্ত্রী ও কন্যা বেশ কিছু অসুবিধার মধ্যে আছেন। যুদ্ধোত্তর ইউরোপে অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ। খাবার-দাবার পাওয়া যায় না, লোকের কাজকর্ম নেই। পটেল বলছেন এমিলিয়ে তাঁর বৃদ্ধা মা ও শিশুকন্যাকে নিয়ে কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছেন। পটেল খবর পেয়েই, বেলজিয়ামে আছেন সুভাষের বন্ধু এবং কংগ্রেস মহলে অনেকের পরিচিত নাথেলাল পারেখ, তাঁকে খবর দিয়েছেন যেন তিনি ভিয়েনাতে গিয়ে ওঁদের জন্য সুবন্দোবস্ত

করেন। এই চিঠি পেয়ে শরৎচন্দ্র বসু কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়েছেন, পটেলকে বলেছেন, অন্য লোককে কিছু বলার আগে সর্বাগ্রে তাঁকেই খবর দেওয়া উচিত ছিল। পটেল লিখছেন, সত্যিই ভুল হয়ে গেছে। আগে আপনাকে বলা উচিত হত। তবে নাথেলাল পারেখ এই মুহূর্তে ইউরোপে আছেন। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নিতে পারবেন তাই ওঁকে জানিয়েছিলাম। দেখা যাচ্ছে সর্দার পটেল ঠিক কাজই করেছিলেন। কারণ শরৎচন্দ্র বসু যখন টাকা পয়সা পাঠাতে চেষ্টা করছেন তখন দেখা গেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নানান গণ্ডগোলে টাকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। আসলে যুদ্ধের পর তখনও অবস্থা স্বাভাবিক হয়নি। ১৯৪৮ সালের শীতকালে ভিয়েনা আসার কিছুদিন পর শরৎচন্দ্র গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। কলকাতায় একটি হার্ট অ্যাটাক হবার পর অসুস্থ শরৎচন্দ্র চিকিৎসার জন্য ১৯৪৯-এর গ্রীষ্মকালে আবার ইউরোপে আসেন। স্ত্রী বিভাবতীও তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। সুইজারল্যান্ডের গ্লিওঁ (Glion) শহরের একটি ক্লিনিকে তিনি চিকিৎসার জন্য ছিলেন। সেই সময়ে শরৎচন্দ্র আন্টি ও অনিতাকে ভিয়েনা থেকে ওঁর কাছে গ্লিওঁতে নিয়ে আসেন। আন্টি ও অনিতা ওঁদের সঙ্গে কিছুদিন সময় কাটান। অনিতা আমাকে বলেছে সেই সময়ের অনেক মধুর স্মৃতি ওর মনে পড়ে। সে ওঁদের বিশেষ স্নেহ পেয়েছিল। শরৎচন্দ্র ও বিভাবতী তারপরে লন্ডনে এসে সেখানে পুত্র শিশিরের সঙ্গে কয়েকদিন কাটান। শিশির যখন তাঁর বাবা-মাকে লন্ডনে বিদায় জানান তখন জানতেন না যে পিতৃদেব শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর জীবনে আর কখনও দেখা হবে না। শরৎচন্দ্র বসুর কলকাতায় তাঁর উডবার্ন পার্কের গৃহে অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে দেহাবসান হয়। তারিখটা ছিল ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০।

স্বামী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ভারতে আসা আন্টির অদৃষ্টে ছিল না। এখন মেজদাদা শরৎচন্দ্র তাঁকে ও অনিতাকে সাদরে দেশে নিয়ে আসার যে পরিকল্পনা করেছিলেন তাও বিনষ্ট হয়ে গেল। আন্টি এবিষয়ে মুখে কোনওদিন কিছু বলেননি, কিন্তু ওঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনার সময়ে আমার মনে হয়েছে যে তাঁর স্বামীর দেশে কোনওদিন যাওয়া হবে না— এটা আন্টি যেন তাঁর বিধিলিপি বলে মেনে নিয়েছেন। পরবর্তীকালে তাঁকে ভারতে আসার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি কখনও রাজি হননি। নেতাজির জন্মদিনের পরদিন প্রত্যেক ২৪ জানুয়ারি আমি ভিয়েনা থেকে আন্টির টেলিফোন পেতাম। উনি জানতে চাইতেন। সবকিছুর খুঁটিনাটি বর্ণনা উনি শুনতে চাইতেন। কখনও কখনও উনি আমাকে বলেছেন, 'জানো কৃষ্ণা আমার খুব ইচ্ছা একবার জন্মদিনের উৎসবে তোমাদের সকলের সঙ্গে যোগ দেব। তবে আমি ছদ্মবেশে যাব, কেউ যেন জানতে না পারে।' এই কথা শুনে আমি হেসে ফেলে বললাম, 'এটা অসম্ভব কথা। যদি তুমি সত্যি কখনও আসতে চাও সেটা খুব খোলাখুলি এবং প্রকাশ্যে করতে হবে। এ খবর চেপে রাখা সম্ভব নয়।'

শিশির তাঁর বাবার মৃত্যুর খবর আকস্মিকভাবে লন্ডনে পেলেন। প্রথমেই তাঁর মেডিকেল পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে যাবার কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু কলকাতা থেকে সকলে বিশেষ করে মা বুঝিয়ে লেখেন, যেন পড়াশুনা ছেড়ে না দেন। লন্ডনের পাঠ শেষ হবার পর তিনি কিছুদিন শেফিল্ডে শিশু চিকিৎসার ট্রেনিং নেন। এরপর তিনি সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরে পড়াশুনা করেন। তারপর তিনি উচ্চতর শিশু চিকিৎসার পাঠ নেবার জন্য ভিয়েনাতে গেলেন। শিশু চিকিৎসার কেন্দ্র হিসেবে ভিয়েনা খুব বিখ্যাত। ভিয়েনার অধ্যাপকদের কাছে শিশির

অনেককিছু শিখলেন। কিন্তু ভিয়েনা প্রবাসের দিনগুলো বিশেষভাবে মনে পড়ত অন্য আর একটি কারণে। ভিয়েনাতে উনি আন্টি, অনিতা আর ওমামার সঙ্গে এক সুন্দর পারিবারিক দিন কাটিয়েছিলেন। ওমামা হলেন অনিতার দিদিমা। ভিয়েনা প্রবাসের সময়ে শিশিরের সঙ্গে আন্টি ও অনিতার এক ঘনিষ্ঠ যোগ গড়ে উঠেছিল এবং সেই ঘনিষ্ঠ যোগ সারাজীবন অটুট ছিল। আমার মনে হয় বাবা শরৎচন্দ্রের অকালমৃত্যুতে শিশির যে গভীর আঘাত পেয়েছিলেন আন্টি ও অনিতার ভালবাসা সেই আঘাত কাটিয়ে উঠতে খুব সাহায্য করেছিল। মৃত্যুকালে শরৎচন্দ্র বসুর বয়স মাত্র ষাট বৎসর ছিল।

ভিয়েনাতে শিশির, আন্টি ও অনিতা খুব আনন্দে দিন কাটাতেন। শিশির প্রায়ই আন্টিকে বাইরে রেস্তোরাঁতে নিয়ে যেতেন আর অনিতার সঙ্গে শিশিরকে খেলার ছলে যুদ্ধ করতে হত। সেই যুদ্ধে অবশ্য শিশির সবসময় পরাজিত হতেন। আন্টির ফ্ল্যাটের ঘরে কার্পেটের উপর পরাজিত শিশিরকে চিত হয়ে শুয়ে পড়তে হত। অনিতা তখন তার উপর চড়াও হয়ে বসে কিল চড় ঘুষি বর্ষণ করে যেত। অনিতা আমাকে অনেক দিন পর বলেছিল, সে বড় হয়ে উঠেছে একটি পরিবারে যেখানে দু'জন নারী তার মা ও দিদিমা তাকে দেখাশুনো করেছেন। শিশিরের মধ্যে সে প্রথম একজন পিতৃসম মানুষ, যাকে বলে ফাদার-ফিগার খুঁজে পেয়েছিল। শিশিরের সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে কলকাতায় মৃত্যু হয়। তার অল্পদিন পরে অনিতা লন্ডনে গিয়ে আমার কনিষ্ঠ পুত্র সুমন্ত্রর সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়েছিল। সেই সময় অনিতা সুমন্ত্রকে বলেছিল সে কোনওদিন পিতা কাকে বলে জানত না। যে মানুষটি তার জীবনে সেই অভাব গত পঞ্চাশ বছর ধরে পূর্ণ করেছিলেন আজ সে তাকে হারিয়েছে।

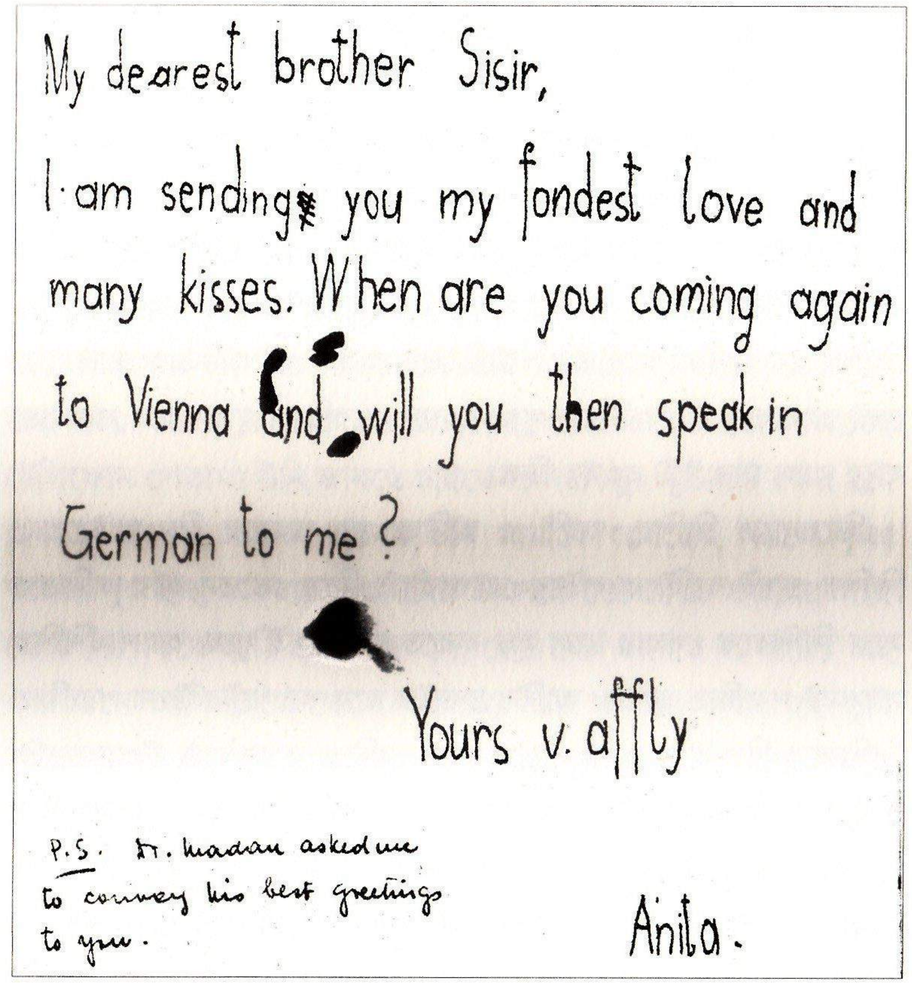

My dearest brother Sisir,

I am sending you my fondest love and many kisses. When are you coming again to Vienna and will you then speak in German to me?

Yours v. affly

P.S. Dr. Madan asked me to convey his best greetings to you.

Anila.

শিশিরকে লেখা অনিতার চিঠি, ১৯৫০।

১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে শিশিরের বোন রমা আর তার ডাক্তার স্বামী শচীশ রায় ভিয়েনাতে এসেছিলেন। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শচীশও ভিয়েনাতে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তাদের প্রথম সন্তান ভিয়েনাতে জন্মগ্রহণ করে। মা ও নবজাতককে দেখাশোনা করার জন্য আন্টি তো

হাতের কাছেই ছিলেন। আন্টির ফ্ল্যাট তখন ছিল ফেরোগাসে (Ferogasse) রাস্তার ওপর।

সুভাষচন্দ্র বসু যে বিবাহ করেছেন এবং তাঁর একটি কন্যা আছে, এই খবর ভারতে এমন অকস্মাৎ অপরিকল্পিত ভাবে জনসমক্ষে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তাতে আন্টি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ব্যাপারটা হয়েছিল এই যে, সুরেশচন্দ্র বসুর অন্যতম পুত্র অরবিন্দ ১৯৫০-৫১ সালে কোনওসময় ভিয়েনাতে গিয়েছিলেন। আন্টি স্বভাবতই তাঁর সঙ্গে খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করেন। তাঁকে পারিবারিক অ্যালবাম থেকে তাঁর নিজের ও শিশু অনিতার ফোটো দেন। ভারতে ফিরে আসার পর তিনি আন্টিকে কিছু না জানিয়ে, কোনও অনুমতি না নিয়ে, এমনকী পরিবারের কোনও গুরুজনস্থানীয়র সঙ্গে পরামর্শ না করে সাংবাদিকদের ডেকে, সুভাষচন্দ্র বিবাহ করেছিলেন এই কথা ঘোষণা করে দেন এবং তাদের হাতে তাঁর স্ত্রী ও কন্যার ছবিও দিয়ে দেন। আন্টি একজন অত্যন্ত প্রচারবিমুখ মানুষ এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সংরক্ষণশীল। যেভাবে তাঁর ব্যক্তিজীবনের কথা জনসাধারণের কাছে হঠাৎ করে উন্মোচিত হল তাতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এই খবর জেনে দেশবাসীর মনে গভীর বিস্ময় এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল।

বিভাবতী বসুকে এবার পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য হাল ধরতে হল। তিনি খবরের কাগজে এক বিবৃতি দিয়ে জানালেন, সুভাষচন্দ্রের বিবাহের খবর সত্য এবং তিনি ও তাঁর প্রয়াত স্বামী শরৎচন্দ্র বসু এমিলিয়ে ও অনিতার সঙ্গে একাধিকবার মিলিত হয়েছেন। সাবমেরিনে ইউরোপ থেকে এশিয়া রওনা হবার আগে সুভাষচন্দ্রের মেজদাদা শরৎচন্দ্রকে বিবাহের খবর জানিয়ে যে মর্মস্পর্শী চিঠিটি লিখেছিলেন, বিভাবতী সেই চিঠিটিও জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করলেন। আচমকা একটা খবর জনমানসে

যে প্রচণ্ড বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল বিভাবতীর বিবৃতির পর তা দূর হল এবং অধিকাংশ মানুষ নিশ্চিত বোধ করলেন।

শিশির আর আমি ভিয়েনাতে আন্টির বাস্টিয়েনগাসের ফ্ল্যাটে কতবার যে গিয়ে ওঁর সঙ্গে থেকেছি! ১৯৭০-এর দশকে আর ১৯৮০-এর দশকে খুব ঘন ঘন যেতাম। অস্ট্রিয়ান ভিসার জন্য আন্টির একটা চিঠির প্রয়োজন হত। আন্টি সবসময় চিঠি পাঠিয়ে দিতেন আর তাতে লিখতেন, আমরা যতদিন অস্ট্রিয়াতে থাকব উনি দেখাশোনা করবেন আর কোনও কারণে ওখানে মৃত্যু হলে ফিউনারেলের জন্য দায়িত্বও উনি নেবেন। এই ফিউনারেলের কথাটা নিয়ে আন্টি এবং আমরা খুব হাসাহাসি করতাম। তখনকার দিনে এরকম কথা লিখতে হবে বলে কোনও নিয়ম ছিল কি না মনে নেই, তবে আমরা যে এই কথা নিয়ে খুব মজা করতাম তা মনে আছে।

শিশির আমি আর আন্টি আমাদের ভিয়েনাতে কাটানো দিনগুলি খুব উপভোগ করতাম। ব্রেকফাস্ট টেবিল থেকে গল্প শুরু হত। শিশির এসে টেবিলে বসলে আন্টি মাঝেমাঝে বলতেন, খুব ওর মতো। হয়তো ওঁর সুভাষের কথা মনে পড়ত। বসুবাড়ির অনেকেরই চেহারায় এবং আকৃতিতে একটা বিশেষ ছাপ আছে। ব্রেকফাস্ট সারা হলে আমি টেবিল পরিষ্কার করে বাসন তুলে নিয়ে যেতাম। শিশির আর আন্টি দু'জনে আরও অনেকক্ষণ বসে কথা বলতেন। তারপরে রান্নাঘরে কাজ করতে করতে, বাসনপত্র ধুতে ধুতে আমি আর আন্টি গল্প করতাম। সেই ১৯৫৯ সালে প্রথমবার যখন আন্টির কাছে এসেছিলাম তখনও রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আমাদের দু'জনের খুব আলাপচারিতা হত। আন্টি মাঝে মাঝে বলে উঠতেন 'Thank God, Krishna talks.' (ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কৃষ্ণা কথা বলে) আমি তো ভীত হয়ে

ভাবলাম আমি বোধহয় খুব বেশি বকবক করছি। কিন্তু তা নয়। পরে এর ব্যাখ্যা শুনেছিলাম, আমার সঙ্গে দেখা হবার কিছুদিন আগে আমার এক ভাশুর ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর দেখা হয়েছিল। সেই ভাশুরের স্ত্রী স্বভাবত স্বল্পভাষী, মাঝে মাঝে একেবারেই কথা বলতেন না। তাই আমি বেশ কথা বলি দেখে আন্টি খুব নিশ্চিন্ত বোধ করেছিলেন। ওমামার মৃত্যুর পর আমি যেবার ভিয়েনা গেলাম আন্টি বললেন, চলো তোমায় মায়ের সমাধিতে নিয়ে যাই। আমি আন্টির সঙ্গে গিয়ে ওমামার সমাধিতে ফুল দিলাম। সমাধিক্ষেত্র থেকে বাড়ি ফিরবার পথে হেঁটে আসতে আসতে আমি আন্টিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, তোমার সঙ্গে একজন ভারতীয় বিপ্লবীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে তোমার বাবা-মা যদি নিষেধ করতেন তা হলে তুমি কী করতে।' এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে আন্টি জবাব দিলেন 'আমি ওঁদের কথা অমান্য করতাম।'

একবার আমাকে আর শিশিরকে আন্টি বললেন, 'চলো তোমাদের অনিতার শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাই।' ভিয়েনা শহরের একটু বাইরে মার্টিনের পরিবারের মস্ত বড় খামার বাড়ি। মার্টিনের বাবা মা আমাদের দেখে খুব খুশি। মার্টিনের বাবা আমাকে আর শিশিরকে ওঁর গাড়িতে তুলে এলাকার চারদিক ঘুরিয়ে দেখালেন, সবুজ গাছপালায় ঢাকা ভারী সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। মার্টিনের মা আমাদের জন্য বিরাট লাঞ্চের রান্না করতে বসলেন। ওঁরা বেশ কয়েকজন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনলেন। লাঞ্চ খাবার পর আমার সকলে ওঁদের বসবার ঘরে এসে বসলাম। সেখানে কফি পরিবেশন করা হল। সেই সময় একটা ভারী মজার ঘটনা ঘটেছিল। সুভাষচন্দ্র নিশ্চয় আন্টিকে ভারতে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে যে দূরত্ব, খোলাখুলি মেলামেশা করা সম্ভব নয়, এসব

গল্প করেছেন, বিশেষ বসুবাড়ি আবার বেশ রক্ষণশীল। আন্টির মাথায় এসব কথা খুব ভালভাবে ঢুকে গিয়েছিল, হয়তো নিজের কল্পনাতে আন্টি এই ব্যাপারটা আরও জটিল করে তুলেছিলেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে এক ভদ্রলোক, আন্টির কীরকম যেন তুতো দাদা, আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার সোফার হাতলে বসে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। কথা বলতে বলতে উনি বন্ধুত্বপূর্ণভাবে একটা হাত দিয়ে আমার কাঁধ একটু জড়িয়ে ধরলেন। ঘরের একেবারে অন্য প্রান্ত থেকে হঠাৎ আন্টির তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভেসে এল, 'না, না, না।' আমি এমন চমকে উঠলাম যে কফি চলকে উঠে কাপ থেকে প্লেটে পড়ে গেল। সেই ভদ্রলোকও খুব হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আন্টি ওঁকে গম্ভীরভাবে বললেন, 'তোমার ওকে স্পর্শ করা উচিত হয়নি।' তারপর যোগ করলেন একমাত্র ওর স্বামীই ওকে স্পর্শ করতে পারে। ভদ্রলোক মহা অপ্রস্তুত হয়ে কেবলই মার্জনা চাইতে লাগলেন আর আমি ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলাম, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এমন কিছু সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেনি। কিছুর মধ্যে কিছু নেই হঠাৎ এমন গণ্ডগোল দেখে শিশির দেখলাম খুব মজা পেয়েছে আর হাসছে।

ভিয়েনা ফিরে যাবার বাসে উঠে দেখলাম এক মস্ত বড় পরিবার সেই বাসে উঠেছে। তাদের মধ্যে একজন একদম মাতাল হয়ে গেছে। উচ্চ স্বরে গান ধরেছে। পরিবারের অন্য সকলে খুব লজ্জিত হয়ে সহযাত্রীদের কাছে ক্ষমা চাইতে লাগল। একজন বললেন, আজ ওর জন্মদিন। তাই শুনে অন্য সহযাত্রীরা হই হই করে বলল তাই নাকি, জন্মদিন? তা হলে ওকে গান গাইতে দাও। আমি বরাবর মাতালদের ভয় পাই, আমি আন্টির পিছনে আশ্রয় নিলাম। পরদিন আন্টি আমাকে আর শিশিরকে ভিয়েনার অনেক গন্তব্যস্থান ঘুরিয়ে দেখালেন। বিকেলবেলা আমরা একটি সুন্দর

আঙুরলতার ছাউনি দেওয়া রেস্তোরাঁর মতো জায়গায় ঢুকলাম। আমার খুব চা তেষ্টা পেয়েছিল, কিন্তু চেয়ে দেখলাম টেবিলের চারদিকে সবাই বসে আছে আর তাদের সামনে বড় বড় মগ ভরতি লাল রঙের ওয়াইন। সেদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন বালকৃষ্ণ শর্মা আর তাঁর অস্ট্রিয়ান স্ত্রী হেলা (Hella)। বালকৃষ্ণ শর্মা যুদ্ধের সময়ে বার্লিনের ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টারে কাজ করতেন। তখন থেকে আন্টির সঙ্গে চেনাশোনা। মহিলা ওয়েটাররা এসে সকলের মগে রেড ওয়াইন ঢেলে দিতে লাগল। আমার মুখের দিকে চেয়ে আন্টি হাসতে লাগলেন, বললেন কৃষ্ণা ভাবছে ওয়াইন খেলে হয়তো কালকের সেই বাসের লোকটির মতো গান গাইতে শুরু করবে।

বালকৃষ্ণ আর হেলা শর্মা একদিন আমাদের ওঁদের ভিয়েনার বাড়িতে লাঞ্চ খেতে নিমন্ত্রণ করলেন। আমি, শিশির আর আন্টি গেলাম। বালকৃষ্ণ শর্মা যুদ্ধের সময়ে বার্লিনের আজাদ হিন্দ রেডিয়োর নিয়মিত ঘোষক ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর সে সময়ে সকলের সুপরিচিত। শিশির তো ওঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই সেই কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেন। প্রথমবার ১৯৪৮ সালে ইউরোপে বালকৃষ্ণর সঙ্গে প্রথম দেখাতেও শিশির ওঁর গলা চিনতে পেরেছিলেন। আমি বালকৃষ্ণকে ধরলাম— আপনি আজাদ হিন্দ রেডিয়োতে কী ঘোষণা করতেন আমাদের একটু শোনাবেন? বালকৃষ্ণ খুব লজ্জিত বোধ করছিলেন। বেশ কয়েকবার অনুরোধ এর পর— Azad Hind Calling, Azad Hind Calling, To Arms to Arms! (আজাদ হিন্দ আহ্বান করছে অস্ত্র হাতে তুলে নিন) খাবার টেবিলে আমরা আগেকার সেইসব দিনের কথা আলোচনা করতে লাগলাম। আন্টিও সেদিন বেশ কথাবার্তা বলার মুডে ছিলেন। অনেক গল্প করছিলেন। একসময় আন্টি কীভাবে নেতাজির বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর শুনেছিলেন সেই কাহিনি

আমাদের শোনালেন। বললেন, 'আমি রান্নাঘরে ছিলাম। আমার মা আর বোনও রান্নাঘরে ছিল। রেডিয়োটা চলছিল। আমরা রেডিয়োতে সন্ধ্যার খবরটা শুনছিলাম। আমি একটা উলের গোলার উল ধীরে ছাড়াচ্ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ শুনলাম সংবাদপাঠক বলছেন— 'ইন্ডিয়ান কুইসলিং সুভাষচন্দ্র বসুর ফরমোসাতে (তাইওয়ানের আগের নাম) এক বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে।' চমকে উঠে আমার মা আর বোন আমার দিকে ফিরে তাকালেন। আমি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। শোবার ঘরে আমার শিশু কন্যা খুব শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। আমি তার বিছানার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লাম। অনিতার বয়স তখন তিন বছরও হয়নি।' আন্টি কয়েক মুহূর্ত নীরব হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'আমি কাঁদলাম।' বাইরে তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। হেলা উঠে গিয়ে জানালার পরদা টেনে দিল।

একজন 'সিঙ্গল মাদার' হিসেবে আন্টির জীবন তাঁর কন্যা অনিতাকে ঘিরেই আবর্তিত হত। যুদ্ধের মধ্যে অথবা যুদ্ধ পরবর্তী কঠিন সময়েও একটি শিশুকে মানুষ করা মোটেই সহজ কাজ ছিল না। আন্টি আর ওমামা তাঁদের রেশনে পাওয়া চিনি, দুধ বেবি অনিতার জন্য জমিয়ে রাখতেন। খাবারদাবার প্রায় পাওয়াই যেত না। আমার মনে পড়ে ১৯৫৯-এর বড়দিনের সময় যখন ভিয়েনাতে আন্টির কাছে আছি, একদিন আমার মাস ছয়েক বয়সের শিশুকন্যাকে একটি সুন্দর ফ্রক পরিয়ে দিচ্ছিলাম। আন্টি পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, হঠাৎ বলে উঠলেন, অনিতা তো ছেঁড়া জামাকাপড় পরে বড় হয়েছে। অনিতাও সেই ঘরেই ছিল। তার বয়স তখন সতেরো। সে হেসে বলল— মা তুমি ভুলে যেয়ো না, আমরা ছিলাম সব যুদ্ধকালীন বাচ্চা।

যুদ্ধ শেষ হলে পর মিত্রশক্তির সেনাবাহিনী যখন ভিয়েনা দখল করে নিল, তখন আন্টি যে এলাকায় থাকতেন সেই এলাকা সোভিয়েতদের হাতে পড়ল। শুনতে পাওয়া যায় সোভিয়েত এলাকাটি সবচেয়ে বিপদজনক ছিল। সেখানে লুটতরাজ, হত্যা, এমনকী মহিলাদের ওপর আক্রমণের ঘটনাও ঘটেছিল। নেতাজির আরেক বন্ধু মিসেস ফুলপ-মিলার আমাদের জানিয়েছিলেন, ওঁর বাড়ি আক্রান্ত হওয়াতে অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে ওঁকে লেখা নেতাজির সমস্ত চিঠিপত্র নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আন্টি আমাদের বলেছিলেন, যে সমস্ত রেড আর্মির অফিসার ওঁদের দিকটা দেখাশোনা করতেন তাঁরা ছিলেন খুব শৃঙ্খলাপরায়ণ ভদ্র। ওঁদের এলাকার যিনি অফিসার-ইনচার্জ ছিলেন তিনি মাঝে মাঝে ওঁদের অ্যাপার্টমেন্টে এসে খোঁজ নিয়ে যেতেন কিছু দরকার আছে কি না, বিশেষ করে ছোট বেবির জন্য কিছুর প্রয়োজন আছে কি। মাঝে মাঝে ইউনিফর্ম ছিঁড়ে গেলে ছোটখাটো সেলাইয়ের কাজ করতে অনুরোধ করতেন, তার বদলে রেশন পৌঁছে দিতেন। একবার এক সৈনিক ঘরের মধ্যে চলাফেরা করতে গিয়ে একটা ফুলদানি ভেঙে ফেলেছিল। তারপর খুব তাড়াতাড়ি রাশিয়া থেকে এনে আরেকটি ফুলদানি বাড়িতে দিয়ে গেল।

নেতাজি ভবনের আর্কাইভসে আমরা দেশ-বিদেশ থেকে অনেক নেতাজি ফিল্ম সংগ্রহ করেছিলাম। ১৯৭০-এর গোড়ার দিকে সেইসব ফিল্ম জোড়া দিয়ে নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো থেকে একটি ডকুমেন্টারি করা হয়। তার নাম হয় 'নেতাজি ইন-অ্যাকশন'। একবার ভিয়েনা যাবার সময় আমরা সেই ডকুমেন্টারিটি সঙ্গে নিয়ে গেলাম। ভিয়েনাতে তখন ছিলেন আমাদের বিশেষ বন্ধু রমেন মুখার্জি আর তাঁর স্ত্রী উমা। আন্টি যাতে ডকুমেন্টারিটা দেখতে পারেন তার জন্য রমেন ভিয়েনার আন্তর্জাতিক

অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের সভাগৃহে সেটি দেখাবার ব্যবস্থা করলেন। আন্টি আমাকে বললেন, 'কৃষ্ণা, আমি যদি নেতাজি ফিল্ম দেখতে দেখতে কেঁদে ফেলি তুমি আমাকে সতর্ক করে দিয়ো।' আন্টি খুব শান্তভাবেই ছবিটি দেখলেন। ছবি দেখার পর আন্টি আমাদের বলেছিলেন যে, ১৯৪৩-১৯৪৫ সালে পূর্ব-এশিয়াতে নেতাজির কার্যকলাপ তিনি তো প্রত্যক্ষ করেননি, এখন ডকুমেন্টারি দেখে সেইসময় সম্পর্কে ওঁর বেশ একটা ধারণা তৈরি হল। ডকুমেন্টারিতে আন্টি দেখতে পেলেন নেতাজি মিলিটারি ইউনিফর্ম পরে সেনাবাহিনীর প্যারেড পরিদর্শন করছেন, বীর সৈনিকদের পদক পরিয়ে দিচ্ছেন, এরোপ্লেনের সিঁড়ি বেয়ে দৃপ্ত পদক্ষেপে নেমে আসছেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের বিশাল সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন। আন্টি খুব মন দিয়ে দেখেছিলেন আর অভিভূত হয়েছিলেন।

একবার শেষের দিকে যখন আমরা ভিয়েনা গেলাম, ১৯৮৭ সাল, আমাদের মনে হল আন্টির অনেক বয়স হয়ে যাচ্ছে, আমরা সকলে সবসময় ওঁর কাছে থাকি কিন্তু এখন হয়তো আমাদের দেখাশুনা করা, সংসারের সব কাজ করা ওঁর পক্ষে কষ্টকর হতে পারে। সেবার আমাদের সঙ্গে আমাদের কনিষ্ঠ পুত্র সুমন্ত্র ছিল, সে তখন টিন-এজার। আমরা ঠিক করলাম এবার রমেন আর উমার সঙ্গে ওঁদের বাড়িতে থাকব। আন্টি বললেন সুমন্ত্র ওঁর সঙ্গে ওঁর বাস্টিয়ানগাসের বাড়িতেই থাকবে। উনি সুমন্ত্রকে খুব আদর যত্ন করেছিলেন আর সুমন্ত্রও ওঁর সঙ্গে থাকা খুব উপভোগ করেছিল। বিশেষ করে অনেক রাত্রে উনি একটু ওয়াইন নিয়ে বসতেন আর ওর সঙ্গে অনেক গল্প করতেন। আমি আর শিশির রমেন আর উমার সঙ্গে নামমাত্র থাকতে পারলাম। রাত্রিবেলা ওঁদের বাড়িতে থাকতাম, ভোরবেলা কোনওমতে এককাপ কফি খেয়ে আন্টির কাছে

ছুটে যেতে হত। একটু দেরি হলেই আন্টি ফোন করতেন। তারপর সারাদিন আন্টির সঙ্গে গল্প-গুজবে কেটে যেত।

বিয়ের পর অনিতা আর মার্টিন বেশ কিছুদিন আমেরিকাতে ছিল। মার্টিন সেখানে পিএইচডি করল। দু'জনেই উচ্চশিক্ষা লাভের পর সেখানে কিছুদিন কাজকর্মও করেছিল। তারপর তারা জার্মানিতে এসে বসবাস শুরু করে। বাভারিয়া প্রদেশের আউগসবার্গ শহরের কাছে তারা নিজেদের বাড়ি তৈরি করে। আন্টি ভিয়েনাতে বেশ কিছুদিন একলাই থাকতেন। শিশির আর আমি যে মাঝে মাঝেই ভিয়েনা যেতাম ওঁর খুব ভাল লাগত। উনি আশা করে থাকতেন আমরা কবে আবার যাব।

একবার একজন অজানা দুষ্কৃতী কলকাতায় শিশির ও আমার সঙ্গে আন্টির বিষয় নিয়ে খুব জঘন্য আচরণ করেছিল। সেটা ছিল এক ১৫ আগস্ট। আমাদের স্বাধীনতা দিবস। কলকাতার রাজভবনে আনুষ্ঠানিক সমাবেশে যোগ দিয়ে শিশির আর আমি সবে বাড়িতে ফিরেছি। আমাদের 'বসুন্ধরা' গৃহে বসবার ঘরের টেলিফোনটা বাজতে শুরু করল। শিশির উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরলেন। আমি দেখলাম ওঁর মুখ একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। আর কোনওমতে টেলিফোনে বললেন, না না, আমরা তো এরকম কোনও খবর শুনিনি। টেলিফোনটা কোনওমতে নামিয়ে ধপাস করে বসে পড়লেন আমি উদ্‌বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কী হয়েছে। শিশির বললেন আমাদের পরিচিত 'আনন্দবাজার'-এর এক সাংবাদিক ফোন করেছিলেন। তিনি জানালেন রয়টার্স খবর প্রচার করেছে যে, আন্টি মারা গিয়েছেন। আন্টির কোনও অসুখ-বিসুখ করেছে বলে তো আমাদের কাছে কোনও খবর ছিল না। শিশির শুনে এমন আঘাত পেয়েছিলেন যে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেননি। শিশির একেবারে ভেঙে পড়লেন, ওঁর মতো

সুখে-দুঃখে অবিচল মানুষের পক্ষে যা অভাবনীয়। তিনি বার বার বলতে লাগলেন আন্টি ছিলেন ওঁর কাছে মাতৃসমা, 'আমার সেকেন্ড মাদার।'

সেকালে বিদেশে টেলিফোন করা খুব ঝকমারি ছিল। প্রথমে কল বুক করতে হত, পরে কলটা আসত, তখন তিন মিনিট বা ছ' মিনিট কথা বলা যেত। আমি তাড়াতাড়ি দুটো কল বুক করলাম। একটা ভিয়েনার বাস্টিয়েনগাসের অ্যাপার্টমেন্টে, অপরটি পুত্র সুগতকে ইংল্যান্ডে, সে তখন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রথমে সুগতর কলটাই এসে পড়ল। টেলিফোনের অপরদিকে সুগতর গলা শুনে আমি কথা বলব কী, কেঁদে ফেললাম। সুগত খুব ভয় পেয়ে গিয়ে কী হয়েছে জানতে চাইল। সংক্ষেপে ঘটনাটা বলে আমি সুগতকে বললাম, প্রথম যে বিমানটা ধরতে পারবে সেটা ধরে এখুনি ভিয়েনা চলে যাও, ওখানে তো কেউ নেই। সুগত বললে, তুমি শান্ত হও। আমি দেখছি। সুগতর ফোন শেষ হতেই ভিয়েনাতে বুক করা কলটা এসে পড়ল। অপর পারে আমি আন্টির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'হ্যালো কৃষ্ণা।'

আন্টি ঘটনাটা শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কী হয়েছিল, আমি কীসে মারা গেলাম। ইতিমধ্যে সুগত আবার ফোন করল। সে বলল লন্ডনে রয়টার্স অফিসের সঙ্গে সে কথা বলেছে এবং তারা জানিয়েছে এরকম কোনও খবর তারা প্রচার করেনি। আমি কলকাতার 'আনন্দবাজার' অফিসে অনেকবার ফোন করার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু কেউ সাড়া দিচ্ছিল না। উত্তেজনার কারণে আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম যে ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে পত্রিকার অফিস বন্ধ। সেখান থেকে কেউ ফোন করতেও পারে না এবং ধরতে পারার কথা নয়। যে সাংবাদিকের নাম করে দুষ্কৃতকারী ফোন করেছিল, তিনি পরে সব শুনে বলেছিলেন, 'লোকটা কি

আর নাম পেল না আমার নামটাই নিতে হল।' সাংবাদিক বন্ধুরা আমাকে বলেছিলেন যে, ভুয়ো ফোন মাঝে মাঝেই আসে, টেলিফোনে যদি গলা চিনতে না পারেন তবে বলবেন আমি ফিরে ফোন করছি।

অনিতা আর মার্টিন আউগসবার্গ ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে কাজ করতে শুরু করেছিল। তারা তাদের আউগসবার্গের সুন্দর বাড়িটিতে বসবাস করতে লাগল। আন্টি তাঁর ভিয়েনার অ্যাপার্টমেন্টে আরও কিছুদিন একাই থাকতেন। আমি আর শিশির প্রায়ই ওঁর কাছে যেতাম। আন্টির সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় আমি বুঝতে পারতাম আন্টি ভালভাবেই জানেন যে, স্বাধীনতা পরবর্তী ভারত সরকার নেতাজির আত্মত্যাগ ও কীর্তি সম্পর্কে উদাসীন এবং প্রচারবিমুখ। একবার আমাকে নিজের কনুই একটু তুলে ধরার ভঙ্গি করে বলেছিলেন, 'জানো তো কৃষ্ণা ওরা তোমাদের আঙ্কলকে এইরকম করে।' তবে আন্টি আসমুদ্র হিমাচল ভারতীয় উপমহাদেশের সকল মানুষ সুভাষচন্দ্রকে কত ভালবাসেন এবং কত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন তা ভালভাবে জানতেন। সুভাষচন্দ্রের প্রতি এই অগাধ ভালবাসা তিনি পরম সম্পদ বলে জ্ঞান করতেন। বেশি বয়স হয়ে যাবার পর আন্টি ভিয়েনা ছেড়ে আউগসবার্গে এসে অনিতা ও তার পরিবারের সঙ্গে শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন। আমরা প্রতি গ্রীষ্মকালে আউগসবার্গে গিয়ে একসঙ্গে থাকতাম।

অনিতা আর মার্টিনের বিবাহের গল্প একটু বলি। ভারতে মার্টিনের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর ভিয়েনাতে দু'জনের গভীর বন্ধুত্ব হয়। অনিতা যখন তার মাকে জানাল যে সে মার্টিনকে বিয়ে করতে চায় আন্টি প্রবল আপত্তি করেছিলেন। আমাকে আর শিশিরকে সে সময়ে আন্টি জানালেন তিনি মার্টিনকে অনিতার উপযুক্ত পাত্র, 'সুটেবল বয়' মনে করেন না। আমাদের

পক্ষে দূর থেকে আন্টির মতামত বুঝে উঠতে পারা সম্ভব ছিল না। আন্টির একটা সমস্যা ছিল এই যে, অনিতা তাঁর জীবনের সর্বস্ব। অনিতা আমাকে বলত ওর যদি কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় আন্টি অমনি তার মধ্যে কিছু না কিছু দোষ খুঁজে পান। আন্টির মনে সবসময় অনিতাকে নিয়ে একটা হারাই-হারাই ভাব। আন্টি তখন আমাদের কাছে আপত্তি প্রকাশ করলেন যে, মার্টিনের পারিবারিক পশ্চাদ্‌পট যথেষ্ট উচ্চশিক্ষিত নয়। উনি জোর দিতে লাগলেন যে, মার্টিনের পিএইচডি হয়ে যাবার পরই বিয়ে করতে পারবে। যা হোক শেষ পর্যন্ত উনি মত দিলেন। ১৯৬৫ সালে অনিতা আর মার্টিনের বিবাহ হল। সেই সময়ে কাকাবাবু শৈলেশচন্দ্র বসুর পুত্র অর্ধেন্দু ইউরোপে ছিল। পরিবারের পক্ষ থেকে অর্ধেন্দু বিবাহে যোগ দিল।

অনিতা আর মার্টিনের বিবাহের পর তারা জাহাজে করে আমেরিকার উদ্দেশে রওনা হল। সেই জাহাজ থেকে অনিতা আমাকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছিল। চিঠিতে সে জানিয়েছিল মার্টিন কেমন চমৎকার মানুষ আর মার্টিনকে বিয়ে করে সে কত সুখী হয়েছে। অনিতার বাবা ও মা সুভাষ ও এমিলিয়ে দু'জনেই চিঠিপত্র লেখায় কত নিয়মিত ও উৎসাহী ছিলেন আমরা জানি। অনিতা অন্যরকম, সে চিঠিপত্র তত লেখে না। সে ভালবাসে টেলিফোনে গল্প করতে আর ই-মেল পাঠাতে। জাহাজ থেকে লেখা অনিতার ওই চিঠিটি আমাকে লেখা তার অন্যতম দীর্ঘ পত্র। মার্টিন পড়াশুনা ভাল করেছিল, পিএইচডি করে অধ্যাপনার কাজে সারাজীবন যুক্ত ছিল। পড়াশুনা ছাড়াও মার্টিন জার্মানির পার্লামেন্টে সদস্য হয়ে জনজীবনেও যুক্ত ছিল। ১৯৯০ সালে মার্টিন সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির (S.P.D.) পক্ষ থেকে জার্মান পার্লামেন্টে (বুন্দেশটাগ) নির্বাচিত হয়ে প্রায় দশ বছর সদস্য ছিল। এদিকে আমি ভারতীয় পার্লামেন্টের

লোকসভায় কলকাতা থেকে নির্বাচিত হলাম ১৯৯৬ সালে। আমি পরপর তিনবার জয়ী হই। তৃতীয় দফায় জয়ী হবার পর ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সাল অর্থাৎ পাঁচ বছর আমি পার্লামেন্টের বিদেশ দপ্তর কমিটির চেয়ারপার্সন ছিলাম। দিল্লিতে এবং বার্লিনে সেইসময় আমার আর মার্টিনের দুই দেশের এমপি হিসেবে নানান মিটিং-এ দেখা হত। মার্টিন আমাকে ঠাট্টা করে বলত, 'হয়তো দুই দেশের পার্লামেন্ট সদস্যদের কোনও মিটিং-এ আমি তোমাকে ম্যাডাম চেয়ারপার্সন বলে সম্বোধন করলাম তুমি কোনও সাড়াই দিলে না।' হতেই পারে কারণ আমি মার্টিনের কাছে থেকে ওরকম সম্বোধন শুনে অভ্যস্ত নই।

অনিতা আর মার্টিন তাদের পঞ্চাশ বছরের বিবাহ বার্ষিকী ২০১৫ সালের জুলাই মাসে উদ্‌যাপন করল।

আন্টি তাঁর জীবনের শেষ কয়েক বছর ভিয়েনা থেকে চলে এসে আউগসবার্গে অনিতা ও তার পরিবারের সঙ্গে কাটিয়ে ছিলেন। মেয়ে-জামাই আর তিন নাতি-নাতনির সঙ্গে আন্টি মহানন্দে দিন কাটাতেন। প্রতি গ্রীষ্মকালে আমি আর শিশির আন্টিকে দেখতে যেতাম। তখন আমাদের ছেলে-মেয়েরাও কেউ না কেউ সঙ্গে থাকত। বেশ একটা পারিবারিক মিলন হত। আন্টির বড় নাতির প্রথম সন্তান নিকো যখন জন্মগ্রহণ করল আন্টি খুব আনন্দ পেলেন। একদিন অনিতার মস্ত বড় কিচেনে আমি আর আন্টি গল্প করছি আর সেইসঙ্গে মেঝেতে ছোট্ট নিকো হামাগুড়ি দিচ্ছে, তার দিকেও লক্ষ রাখছি। এমন সময় আন্টি আমাকে বললেন, 'কৃষ্ণা আমি ভেবেছিলাম জীবনে সব উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছি। এখন এই পৃথিবীর মায়া কাটাতে পারলেই ভাল। কিন্তু এখন আমার এই ছোট্ট বাচ্চাটার বড় হয়ে ওঠা দেখার জন্য আরও কিছুকাল বেঁচে থাকতে ইচ্ছা

করছে।' আন্টি যখন অনিতার বাড়িতে থাকতেন তখন অনিতার বাড়ি যে কোনও ভারতীয় যৌথ পরিবারের মতো মনে হত। চারপুরুষ একই ছাদের তলায় একসঙ্গে বসবাস করছেন।

এইসময়ে আন্টি একটা স্ট্রোলার নিয়ে এঘর ওঘর ঘুরতেন। বয়স হয়েছিল তা ছাড়া হাঁটুর সমস্যায় ভুগতেন। আন্টির মতন আমারও হাঁটুর সমস্যা ছিল কিন্তু আমি হাঁটু উপস্থাপন সার্জারি করে ভাল হয়ে গিয়েছিলাম। আন্টির বয়স হয়ে যাবার পর অনিতা তাঁর কত যে যত্ন করত। নিজের হাতে আন্টির সেবা করত। আন্টি অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন। যতদিন পারেন ভিয়েনার ফ্ল্যাটে একাকী জীবন স্বাধীনভাবে কাটাতে সচেষ্ট ছিলেন। আমি উনি কেমন আছেন খোঁজ নিতে প্রায়ই কলকাতা থেকে ফোন করতাম। আন্টি আমাকে বলতেন, 'একদম চিন্তা করবে না।' আন্টির দু'জন সমবয়সি বন্ধু ভিয়েনাতে থাকতেন। রোজ সকালে ওঁরা একে অপরকে ফোন করে জেনে নিতেন ওঁরা ঠিক আছেন কি না। এরমধ্যে একদিন সকালে আন্টি তাঁর ফ্ল্যাটে পড়ে গিয়েছিলেন। টেলিফোনটা বেশ উঁচুতে ছিল তাই ধরতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে যেতে হল। অনিতা খবর পেয়ে চলে এল। এবার আন্টি বুঝতে পারলেন আর বোধহয় একাকী থাকা চলবে না। উনি অনিতার কাছে চলে গেলেন।

১৯৯৫ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসীমা রাও সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি সুভাষচন্দ্রের দেহাবশেষ টোকিয়ো থেকে ভারতে ফিরিয়ে আনবেন। দিল্লিতে একটি স্মারক নির্মাণ করে সেখানে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। তিনি তদানীন্তন বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখার্জিকে আন্টি ও অনিতার

সঙ্গে দেখা করতে জার্মানিতে পাঠান। নরসীমা রাও বলেছিলেন এই ব্যাপারে তিনজন ব্যক্তির সম্মতি চান, তাঁরা হলেন স্ত্রী এমিলিয়ে, কন্যা অনিতা এবং শিশিরকুমার বসু। শিশির ও অনিতা তো বেশ কিছুদিন ধরে নেতাজির দেহাবশেষ সসম্মানে ভারতে ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছিল। প্রণব মুখার্জি জার্মানিতে গিয়ে আন্টির সঙ্গে দেখা করার পর তিনিও এ ব্যাপারে সম্মতি দিলেন। প্রণব মুখার্জি যেদিন আন্টির সঙ্গে দেখা করেন তিনি চলে যাবার পরই আন্টি আমাকে একটি চিঠি লেখেন। আন্টি লেখেন, 'আজ বিদেশ মন্ত্রী প্রণব মুখার্জি দেখা করতে এসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ভারতের রাষ্ট্রদূত লাম্বা। বেশ ভাল মিটিং হল। তোমাদের তো মার্টিন ও অনিতা ফোন করে সব খবর ইতিমধ্যে বলে দিয়েছে।'

প্রণববাবু দেশে ফিরে আমাকে ও শিশিরকে বলেছিলেন, তিনি আন্টির আতিথেয়তা ও ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছেন। সকলে একসঙ্গে বসে গল্পগুজব করে লাঞ্চ খেয়েছিলেন।

এই যে এমিলিয়ে, অনিতা আর শিশিরের সম্মতি নরসীমা রাও চেয়েছিলেন, এ ব্যাপারে তাঁদের মনের ভাব কেমন ছিল!

বহুদিন পর্যন্ত আন্টি মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা লালন করতেন হয়তো বা কোনওদিন তাঁর স্বামী ফিরে আসবেন। যদিও সেই ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে আইরিশ বন্ধু মিসেস ই উডসকে একটি চিঠিতে উনি লিখেছিলেন, উনি বিশ্বাস করেন সুভাষের মৃত্যু হয়েছে। মিসেস ই উডস ছিলেন সুভাষ ও এমিলিয়ে দু'জনেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আর মিসেস উডস ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বলিষ্ঠ সমর্থকও ছিলেন। আন্টি ১৯৪৬-এর জানুয়ারিতে মিসেস উডসকে লেখেন, 'তুমি আমাদের দু'জনের বন্ধু (সুভাষ) সম্পর্কে যে কথা লিখেছ, আমি দুঃখিত আমি

তোমার যে আশা তার ভাগ নিতে পারছি না। আমার মন বলছে যে সে মারা গিয়েছে। একথা যদি সত্য না হয় আমার চাইতে বেশি খুশি আর কেউ হবে না। এই খবর (বিমান দুর্ঘটনা) যখন প্রথম শুনলাম মনে এমন আঘাত পেলাম যে বাড়িতে সংসারের কাজ, অফিসের কাজ সবই সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে কোনওমতে যন্ত্রের মতো করে যেতাম। আমার একমাত্র সান্ত্বনা ছোট্ট অনিতা।'

মানুষ আশা নিয়ে বেঁচে থাকে। শিশিরকে লেখা পঞ্চাশের দশকের চিঠিতেও আমি দেখেছি আন্টি লিখছেন— আজ আমি এই স্বপ্ন দেখলাম। এই স্বপ্নের কী ব্যাখ্যা হতে পারে তোমার মনে হয়? অথবা আর এক চিঠিতে লিখছেন, আমি এক মহিলার কাছে গিয়েছিলাম। তিনি ক্রিস্টাল দেখেন (crystal gazing)। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আশা ধীরে ধীরে নির্বাপিত হয়ে যায়। শিশিরকে এমন চিঠিও লিখেছেন উনি, কোথাও থেকে থাকলে এতদিনে অন্তত তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। শেষপর্যন্ত নিজের নিয়তি আন্টি মেনে নিয়েছিলেন।

আশা-নিরাশার একইরকম দোলাচল আমি প্রথমদিকে শিশিরের মধ্যেও প্রত্যক্ষ করেছি। ১৯৬৫ সালে উনি নিজে জাপান ও তাইওয়ান গিয়ে নিজের মতো করে অনুসন্ধান করেন। রেনকোজি মন্দিরের পুরোহিত মোচিজুকি ওঁকে দেহাবশেষের আধার পূজা অর্চনার পর খুলে দেখান। তিনি বলেন, তুমি দ্বিতীয় ব্যক্তি যার জন্য আমি এই আধার খুলে দেখালাম, প্রথমজন হলেন জওহরলাল নেহরু। তাইওয়ানে ফরেন অফিস, হাসপাতাল, ক্রিমেটোরিয়াম পরিদর্শন করেন, অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তারপর শিশির বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে নিঃসংশয় হন।

অনিতা টোকিয়োতে যায় ১৯৭৯-এ। তখন সে বিমান দুর্ঘটনার সময়ে

সহযাত্রী, গুরুতর আহত হয়েছিলেন তবে বেঁচে যান এমন কয়েকজনের সাক্ষাৎ পায় ও জিজ্ঞাসাবাদ করে। তারপর সে আমাদের বলে, এঁরা সাধারণ জাপানি নাগরিক, তখনও দেহে আঘাতের চিহ্ন বহন করছেন। আমার বাবার মৃত্যু নিয়ে এঁরা আমাকে মিথ্যা কথা বলতে যাবেন কেন? এদের তো কোনও স্বার্থ নেই। অনিতাও নিঃসংশয় হয়।

এই তিনজন— এমিলিয়ে অনিতা ও শিশির-এর সম্মতি নরসীমা রাও চেয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেন। ১৯৯৬-এর গোড়ার দিকে নেতাজি শতবর্ষের শুরুতে দেহাবশেষ বিশেষ সম্মানের সঙ্গে দেশে ফিরিয়ে আনবার পরিকল্পনা ওঁর ছিল। কিন্তু সেই পরিকল্পনা উনি বাস্তবায়িত করতে পারেননি। ১৯৯৬ সালের মে মাসে ভারতে সাধারণ নির্বাচন হয়, নরসীমা রাওর সরকার পরাজিত হয়। ঘটনাচক্রে সেই নির্বাচনে জয়ী হয়ে আমি লোকসভায় প্রবেশ করি। তারপর নানা বর্ণের সরকার এসেছে গিয়েছে। নরসীমা রাওর মতো বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত কেউ নিতে পারেনি। নরসীমা রাও মনে করেছিলেন, যদিও কিছু লোক মৃত্যু নিয়ে নানারকম মত পোষণ করেন এবং তাঁরা যথেষ্ট সরব, প্রকৃতপক্ষে দেশের সাধারণ মানুষ যাঁরা নীরব তাঁরা তাঁদের প্রিয় নেতার দেহাবশেষ বিদেশ থেকে মহা সমারোহ ও শ্রদ্ধা সহকারে নিয়ে আসার প্রস্তাবে আনন্দের সঙ্গে সাড়া দেবেন। জাপানের কাছে ভারতবাসী হিসেবে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যে, ১৯৪৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তারা আমাদের দেশনায়কের দেহাবশেষ নিত্য পূজা করে মন্দিরে রক্ষণাবেক্ষণ করে চলেছে।

এমিলিয়ের জীবনের শেষ ক'টি দিন

নেতাজি সুভাষচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৯৭ সালে। কলকাতার নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোতে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ১৯৯৬ সালের ২৩ জানুয়ারি থেকে আমরা শতবর্ষের উৎসবের সূচনা করব। সারা বছর ধরে কর্মসূচি চলবে আর ১৯৯৭-র ২৩ জানুয়ারি বিশেষ মহোৎসবের মধ্যে শতবর্ষ পালন সমাপ্ত হবে।

অনিতা আর মার্টিন ঠিক করল তারা শতবর্ষ সূচনাতে ১৯৯৬-এর ২৩ জানুয়ারি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। আমি ৯০ শরৎ বসু রোডের আমাদের 'বসুন্ধরা' গৃহে অনিতা আর মার্টিনের ঘর গোছগাছ করছিলাম এমন সময় মার্টিনের টেলিফোন পেলাম তাদের ভারতে আসার ভ্রমণসূচি বাতিল করতে হয়েছে। অনিতা হঠাৎ অসুস্থ হওয়াতে তাকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

আমরা জানতাম অনিতা অতিরিক্ত খাটাখাটনি করে। ভারতে আসার আগে আরও কাজ বেড়ে যায়। যে সময়ে তারা জার্মানির বাইরে থাকবে সেই সময়ের জন্য আন্টিকে একটি নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। দেখাশুনা করার তো কেউ নেই। তারপর নিজেদের যাতায়াতের ব্যবস্থা। আর অনিতার বরাবরের অভ্যাস ভারতে আসার আগে প্রত্যেকবার পরিবারের সকলের জন্য রাশি রাশি উপহার কিনবে,

সুন্দর করে রঙিন কাগজে মুড়বে— কাজের শেষ নেই।

মার্টিন একটু পরে আবার আমাদের জানাল ওরা ভারতের বিমান ধরার জন্য ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে যাবার পথে আউগসবার্গ রেলস্টেশনে পৌঁছেছিল। অনিতা মার্টিনের আগে আগে হেঁটে যাচ্ছিল, হঠাৎ সে প্ল্যাটফর্মের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। কাজের চাপের জন্য অসুস্থতা নয়, ডাক্তারেরা জানিয়েছেন তার ব্রেনে টিউমার ধরা পড়েছে। অপারেশন জরুরি। ইতিমধ্যে আন্টি তাঁর নার্সিংহোমে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অনিতার অসুখের খবরে, আন্টি বিশেষরকম বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। দু'দিকে দুই অসুস্থ মানুষ। মার্টিন অনিতার সঙ্গে হাসপাতালে দিন কাটাতে লাগল। তাদের কন্যা মায়া আন্টির দেখভাল করছিল আর একটু পরে পরেই আমাকে আন্টির শারীরিক অবস্থার খবর দিয়ে চলছিল।

আমি একদিন আন্টির নার্সিংহোমে তাঁর ঘরে ফোন করলাম। আন্টি ফোন ধরলেন, কণ্ঠস্বর খুব দুর্বল আর যন্ত্রণাক্লিষ্ট শোনাল। টেলিফোনে আমার গলা শুনে আন্টি বললেন, 'কৃষ্ণা, আমি তোমাকে থ্যাংক ইউ বলতে চাই।' আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। কীসের জন্য থ্যাংক ইউ।

আন্টিকে একথা জিজ্ঞাসা করে আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম এর মধ্যে কি আমি আন্টিকে কোনও উপহার পাঠিয়েছি। কেউ ইউরোপ যাচ্ছেন খবর পেলে আমি মাঝে মাঝেই তাঁদের হাতে আন্টি পছন্দ করেন এমন কিছু ভারতীয় জিনিসপত্র পাঠাতাম। কিন্তু ইদানীং কালে আমি কিছু পাঠিয়েছি বলে মনে করতে পারলাম না।

'তুমি কি অনিতার জন্য চিন্তা করছ?' আমি আন্টিকে জিজ্ঞাসা করলাম। 'চিন্তা কোরো না অনিতা শিগগিরই ভাল হয়ে উঠবে আর বাড়ি ফিরে যাবে।' আন্টি জবাবে বললেন, 'আশা করি তাই হবে।' কিন্তু তাঁর

বলার ভঙ্গি একেবারে হতাশ শোনাল। তারপর আন্টি বললেন, 'তুমি আর শিশির যা কিছু করেছ তার জন্য আমি তোমাদের থ্যাংক ইউ বলতে চাই।' এ কথা শুনে আমার হৃৎস্পন্দন থেমে যাওয়ার উপক্রম হল! আন্টি এভাবে কথা বলছেন কেন! আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'আন্টি আমি আর শিশির শিগগিরই আউগসবার্গ আসব, তোমার সঙ্গে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে।'

আন্টি আবারও একবার বললেন, 'তোমরা যা করেছ তার জন্য অনেক থ্যাংক ইউ।'

আন্টির সঙ্গে সেই আমার শেষ কথাবার্তা। তাঁর শেষ আশীর্বাদ আমি নিতান্ত সংকোচের সঙ্গে নতমস্তকে গ্রহণ করলাম। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা তাঁর জীবনব্যাপী আত্মত্যাগ ও উচ্চশির আত্মমর্যাদা বোধের জন্য আন্টি এমিলিয়েরই প্রাপ্য। আমার নিজের কথা যখন ভাবি তখন মনে হয় চার দশক ধরে আমি তাঁর কাছে যে স্নেহ, ভালবাসা, সখ্য পেয়েছি তার জন্য আন্টির কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। শিশিরের সারা জীবনের 'মিশন' ছিল তাঁর রাঙাকাকাবাবু নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জীবন ও আদর্শের অমূল্য উত্তরাধিকার পরবর্তী প্রজন্ম যাঁরা স্বাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ করবে, তাদের জন্য সংরক্ষণ করে রেখে যাবেন— শিশিরের সেই কর্মকাণ্ডে চারদশক ধরে যে অবিচল সমর্থন তিনি দিয়ে গেছেন তার জন্য আন্টি এমিলিয়ের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার কোনও পরিসীমা নেই।

১৯৯৬-এর মার্চ মাসে আন্টির জীবনাবসান হল। শিশিরের নিজের স্বাস্থ্য সে সময় ভেঙে পড়েছে। ভিয়েনাতে ফিউনারেলে যোগ দিতে যাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের পুত্র সুগত আউগসবার্গে গেল। আমার ননদ রমাও উপস্থিত ছিল। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এক ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে

পাঠানো হল। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আমাকে একটি শোকবার্তা লিখতে অনুরোধ করেছিল। আমি লিখলাম— 'আমি তার জন্য কোনও শোক করব না। আজ এই নারীর দীর্ঘ বিরহের অবসান হল।' 'সংগ্রামী নারীর দীর্ঘ বিরহের অবসান' নামে লেখা প্রকাশিত হল।

নির্দেশিকা

অনিতা ১, ৩, ৭-১৪, ১৬, ১৭, ১৯, ৩০, ৪১, ৪৬, ৫৫, ৫৭, ৬৯, ৭১, ৭৪, ৭৭, ৭৯, ৮১, ৮৫, ৯০, ৯৩, ৯৫-৯৮, ৯৯, ১০১-১০৩
অভীক সরকার ২২, ৩০, ৩১
অমিয়নাথ (বসু) ১৫, ২৮, ৪৯, ৫৪, ৭৪
'অমৃতবাজার পত্রিকা' ১৫, ৬২
অরবিন্দ বসু ৮৫
অরল্যান্ডো মাৎসোটা ২৫, ৬৬ *দ্রষ্টব্য* সুভাষচন্দ্র বসু
'অর‍্যাকল' পত্রিকা ৫৪
অর্ধেন্দু বসু ৯৬
অশোক বসু ৭৪
অস্ট্রিয়া ২৯, ৫৫, ৮৬
অস্ট্রিয়া-ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন ৩৬
অ্যাডাম ফন ট্রট ৬৮, ৬৯
অ্যান্টওয়ার্প ৩৬
অ্যালসেশিয়ান কুকুর ৫৭

আইএনএ ৭৫
আউগসবার্গ ১, ২, ৮, ১৮, ১৯, ৪১, ৪৬, ৫৫, ৬৭, ৯৩, ৯৫, ৯৭, ১০৪
আউগসবার্গ ইউনিভার্সিটি ৯৫
আজাদ ৬১
'আজাদ হিন্দ' ২৬
আজাদ হিন্দ ফৌজ ৯২
আজাদ হিন্দ রেডিয়ো ৮৯
'আনন্দবাজার', 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ১৫, ২২, ৩০, ৩১, ৯৩, ১০৫
আন্তর্জাতিক অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের সভাগৃহ ৯১, ৯২
আবিদ হাসান ১২, ৬৯
আমেরিকা ৯৩, ৯৬
আর্থার রোড কারাগার ৪৭
আলেকজান্ডার ওয়ার্থ ২৩, ৬৮

(মিসেস) ই উডস ৯৯
ইউরোপ ২, ৬, ১৭, ২০, ৩২-৩৪, ৩৬, ৩৯, ৪০, ৫৩, ৬০, ৬৬, ৭১, ৭২, ৭৪, ৭৫, ৮১, ৮৫, ১০৩

ইংল্যান্ড ৫১, ৭৫, ৯৪
ইটালি ৭৭
ইন্ডিয়া ডেস্ক, জার্মান ফরেইন অফিস ৬৮
'ইন্ডিয়ান পিলগ্রিম' বা 'ভারত পথিক' ৫৩
'ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' ৩২-৩৪
ইন্দিরা গাঁধী ৪০
ইন্দো-চেক ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি ৩৬
"ইমপর্ট্যান্ট উইমেন ইন নেতাজি'স লাইফ" ২৩, ২৬
'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি' ২৬, ২৮

উডবার্ন পার্ক ৫, ১১, ১৪-১৭, ২৫, ২৮, ৭৪, ৭৭, ৭৮, ৮১
উত্তর আফ্রিকা ৬৭
উমা মুখার্জি ৯১, ৯২

"এক নম্বর বাড়ি" ১৮
এথেন্স ৩৩
এন জি স্বামী ৬৯, ৭৫
এম আর ব্যাস ৬৯
(সিস্টার) এলভিরা ৩৫
এলাহাবাদ ৫১
এশিয়া ৭০, ৮৫
এস এ আয়ার ১২

ওমামা (অনিতার দিদিমা) ৭, ৮৩, ৮৭, ৯০
ওয়ার্ধা ৬১
ওয়ালটার হার্বিশ ৬৭, ৬৮
'ওরিয়েন্ট' ৬২
ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট ২৩, ২৬

কংগ্রেস ২৯, ৩৮, ৬৪
কংগ্রেসের সভাপতি, জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ২০, ৬০-৬৪
কটক ১৩
কনকলতা (ছোট পিসিমা) ১৭, ১৮
কমলা নেহরু ৩৭-৪০
কলকাতা ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৫০, ৮১, ৯৭, ৯৮, ১০২
(ডা.) কাটিয়ার ৩৯
কাপ্রি ৩৪
কায়রো ৩৩
কার্লোভিভারি, কার্লসবাদ ৮, ৩৫, ৩৬, ৩৯, ৫১
কার্শিয়াং ৪৭-৫০
কালিদাস ৪৮
কিটি কুর্টি ৫০
কুনুর ৭৪
কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ৯৪
কোলোন ৩৬
ক্যুর হাউস হকল্যান্ড ৩৭, ৪৬, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৫৭
ক্ল্যারিটা ৬৯

খুশবন্ত সিং ২৬, ২৮

গিরিজা মুখার্জি ৬৯
'গীতা', ভগবৎ গীতা ৪৯, ৫০
গীতা (ন'দি) ২৮
গুজরাত ৬১
গ্যারিবল্ডি ৭১
গ্যেটে ৪৮
গ্রুনের বম ৫৭, ৫৮
গ্রেট ডিপ্রেশন ৩৬
গ্লিওঁ ৮১

চঞ্চল সরকার ১৫
(দেশবন্ধু) চিত্তরঞ্জন দাশ ১৭, ২৪, ২৬
চিত্রা ৭৫, ৭৮, ৭৯
চেকোশ্লোভাকিয়া ৮, ২৩, ৭৬
চেট্টিয়ার (A. K. Chettiar) ২৯, ৫৪

জওহরলাল নেহরু, নেহরু ১১, ১২, ১৬, ৩৭-৪০, ৬১, ৬৩, ৬৪, ১০০
'জরুরি কিছু লেখা' ৪৫
জানকীনাথ বসু ১১, ১৩, ৩৩
জাপান ৭০, ১০০, ১০১
জামাডোবা ৬৪
জার্মান পার্লামেন্ট (বুন্দেশটাগ) ৯৬
জার্মান ফরেন অফিস ২৫, ৬৮
জার্মানি ১, ২, ১২, ২০, ৩৯, ৫৫, ৬৭, ৭২, ৭৫, ৯৩, ৯৯
জিন্না ৬১
জ্যোতি বসু ৩১

ঝাড়খণ্ড ৬৪

টোকিয়ো ৯৮, ১০০

ডাবলিন ৭৭
ডালহৌসি পাহাড় ৫১-৫৩
(প্রফেসার) ডেমল ৩৫, ৫৩

তাইপে ৭৬, ৭৭
ত্রিপুরি কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন ৬৩, ৬৪

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ৬
দক্ষিণারঞ্জন বসু ১৫
দার্জিলিং ৪৭, ৪৮
দিল্লি ৬, ১৬, ৪০, ৯৭, ৯৮
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ৬, ২৫, ৫৯, ৬৫, ৬৬, ৭০, ৭৪

(ড.) ধরমবীর ৫১
ধ্রুপদী ইউরোপীয় সংগীত ৪৯

নাওমি ফেটার ৪০, ৫০, ৫৩

নাথেলাল পারেখ ৮০, ৮১
নাম্বিয়ার ৫৪, ৬৯, ৭১
নিকো ৯৭
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ৬৩
নীলগিরি পাহাড় ৭৪
নেতাজি *দ্রষ্টব্য* সুভাষচন্দ্র বসু
'নেতাজি ইন-অ্যাকশন' ৯১
নেতাজি ভবন ১১
নেতাজি ভবনের আর্কাইভস ৯১
নেতাজি ভবনের মিউজিয়াম ৩৬
নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো ১৯, ৪১, ৫৪, ৫৬, ৬৮, ৯১, ১০২
নেতাজি শতবর্ষ ১০১, ১০২
নেতাজির বিমান দুর্ঘটনা ৮৯, ৯০, ১০০
নেপলস ৩৪
নেহরু মিউজিয়াম ২৭, ৪০
নেহরু সরকার ৭৫

পঞ্জাব ৬, ৫১
পটেল *দ্রষ্টব্য* (সর্দার) বল্লভভাই পটেল
পণ্ডিতজির ঘর ১২
পম্পেই ৩৪
পিভি নরসীমা রাও ৯৮, ৯৯, ১০১
পুণে ৪৭
পূর্ব এশিয়া ২০, ৭২, ৭৫, ৯২
পূর্ব বার্লিন ২৩
প্যারিস ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৭৭
প্রণব মুখার্জি ৯৮, ৯৯
প্রভাবতী দেবী (সুভাষচন্দ্রের মা) ২৪, ২৬, ৩৩, ৩৮, ৫০
প্রাগ ২৩, ২৬-২৮, ৩৬, ৭৬
প্রেসিডেন্সি জেল ৬

ফরওয়ার্ড ব্লক ৩০
ফরমোসা (তাইওয়ান) ৯০, ১০০
ফেরোগাসে (Ferogasse) ৮৫
ফৈজলাবাদ ৬
ফ্রাউ লোয়ি (Frau Lowy) ৫১
ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দর ১০৩
ফ্রান্স ২
'ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার' ৬৭, ৬৯, ৭৫, ৮৯

বম্বে ১৩, ৩৪, ৪৭, ৬১, ৭৫
(সর্দার) বল্লভভাই পটেল ৬১, ৭৬, ৮০, ৮১
বসু পরিবার ৯, ৮০
বসুবাড়ি ২৪, ৭৪
'বসুবাড়ি' ৪৯, ৭৬, ৭৮
বসুবাড়ির সদস্য, বসু পরিবারের সদস্য ৭৪, ৭৫
'বসুমতী' ১৫

'বাইবেল' ৫০
বাগদাদ ৩৩
বাঙ্গালোর ১৩
বাডেনওয়াইলিয়ের ৩৯
বাদগাস্টাইন, হফগাস্টাইন ২৭-২৯, ৩৫-৩৭, ৩৯, ৪৬, ৫৩-৫৯, ৬২, ৬৪, ৬৫, ৭৪
বাভারিয়া ৯৩
বার্ন ২, ৮২
বার্লিন ২৩, ২৫, ২৮, ২৯, ৩৬, ৫০, ৫৮, ৬৬-৬৯, ৭২, ৮৯, ৯৭
বালকৃষ্ণ শর্মা ৮৯
বাসন্তীদেবী, ঠাকুমা ১৬, ১৭, ২৪, ২৬
বাস্টিয়েন-গাসে (Bastien-gesse) ৬, ৭, ২৪, ৮৬, ৯২, ৯৪
বি আর নন্দ ২৭
(ডা.) বিধান রায় ৫২
(স্বামী) বিবেকানন্দ ৩৫
বিভাবতী বসু, মেজোবউদি ৫, ৬, ২৪, ২৬, ৭৪, ৭৮, ৭৯, ৮১, ৮৫, ৮৬
বিহার ৬৪
বেলজিয়াম ৮০
ব্রাজিল ৭১
ব্রিটিশ আর্কাইভস ২০
ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মি ৬৭
ব্রিটিশ সরকার, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ৩৯, ৪০, ৭৪
ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ৭০
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ৬৬

ভক্তিলতা দেবী ১৩
ভগতরাম তলোয়ার ১২
(অধ্যাপক) ভাইডেমান ২৩
ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা ৪৯
(মি.) ভাট (Bhatt) ২৬
ভারত ৩৩, ৪০, ৬২
'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ৬৭
ভারত সরকার ৮০
ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ৬৭
ভারতীয় পার্লামেন্ট ৯৬
ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ৭০
ভিক্টোরিয়া ধরমবীর ৫১
ভিয়েনা ১, ৩, ৫, ৬, ৮, ৯, ১৭, ১৯, ২০, ২৩, ২৫-২৭, ৩২, ৩৫-৩৭, ৩৯, ৪৮, ৫২, ৫৩, ৬০, ৬৬, ৬৮, ৭০, ৭২, ৭৫, ৭৭-৮৩, ৮৫-৮৮, ৯০-৯৫, ৯৭, ৯৮
ভিলেনোভ ৩৭, ৪০
ভেনিস ৩৩

মকরধ্বজ ৬৯
'মডার্ন রিভিউ' ৩৭, ৬২

মধ্যপ্রদেশ ৬৩
মহাত্মা গাঁধী, গাঁধী-মহারাজ, গাঁধীজি, বাপু ১১, ১২, ৩৮, ৫৪, ৬১-৬৪, ৬৬
(ডা.) মাথুর ৩২
মায়া ৩, ১০৩
মার্টিন পাফ ৩, ১৩, ৪৬, ৫৫, ৮৭, ৯৩, ৯৫-৯৭, ১০২, ১০৩
মিউনিখ ৭, ৯, ৬৭
মিত্রশক্তি ২০, ৯১
মিলোসাভ ক্রাসা ২৬
মুসোলিনি ৩৪, ৩৫
মেজদাদা *দ্রষ্টব্য* শরৎচন্দ্র বসু
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ৫০
মোচিজুকি ১০০
মোৎসার্ট প্লাজা ৫৫
মোৎসার্ট রেস্তোরাঁ ৫৫

'যুগান্তর' ১৫
য়ারবেদা জেল ৪৭

রঞ্জিৎ বসু ১৬
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৮, ৬২, ৬৪
রমা ৭৫, ৭৭-৭৯, ৮৪, ১০৪
রমেন মুখার্জি ৯১, ৯২
রাঙাকাকাবাবু *দ্রষ্টব্য* সুভাষচন্দ্র বসু
রাজীব গাঁধী ১৬
রাশিয়া ৯১
রেণু ৫২
রেনকোজি মন্দির ১০০
রোম ৯, ১৯, ৩৩, ৭০, ৭৫
রোমাঁ রোলাঁ ৩৭, ৪০

লক্ষ্মী (সাহগাল) ৭২
লন্ডন ২, ৩৪, ৬০, ৭৫, ৭৭, ৮১, ৮২
লসান ৩৭, ৩৯, ৪০
লাম্বা ৯৯
লায়লপুর ৬
লালকেল্লা ৬
লাহোর ৬, ৫১, ৬৫
লাহোর ফোর্ট ৬
লেক আনেসি ২
লেক কনস্টানস্ ২
লেনার্ড গর্ডন/লিওনার্ড গর্ডন ২৭, ২৮, ৫৯

'শকুন্তলা' ৪৮
শচীশ রায় ৮৪
শরৎ বসু ভবন ১১
শরৎচন্দ্র বসু ৫, ৬, ১১, ১৭, ২১, ২২, ২৮, ৩৫, ৩৮, ৩৯, ৪৭, ৬২-৬৪, ৭২-৮৩, ৮৫
শিশির, শিশিরকুমার বসু ২, ৩, ৫-৭, ১০, ১২, ১৪, ১৯, ২১-২৪, ২৭, ২৮, ৪১, ৪৮, ৪৯, ৬৮, ৭৫-৭৯, ৮১, ৮২, ৮৬-৮৯, ৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৭, ৯৯-১০১, ১০৪
শেফিল্ড ৮২
শৈলেশচন্দ্র বসু (কাকাবাবু) ১৩, ৯৬

সতীশচন্দ্র বসু ১৪
সরোজিনী নাইডু ১১
সর্বভারতীয় আন্দোলন ৬৬
সলিটারি কনফাইনমেন্ট ৬
সিঙ্গাপুর ৭০
সিলস মারিয়া ৬৮
সীতারামাইয়া ৬২
সুইজারল্যান্ড ২, ৬৮, ৭৭, ৮১, ৮২
সুগত বসু ২, ৩, ১৯, ২১, ২২, ২৭, ২৮, ৪১, ৪৬, ৫৫, ৫৬, ৯৪, ১০৪
সুধীরচন্দ্র বসু ৬৪
সুনীল জানা ৫
সুনীলচন্দ্র বসু ৬৩
সুব্রত বসু ৭, ৭৮
সুভাষ, সুভাষচন্দ্র (বসু) ১, ৬, ৮, ৯, ১১, ১৩, ২৩, ৪৯, ৭৮, ১০৪
সুভাষচন্দ্রের রচনাবলি, সুভাষ রচনাসমগ্র ১৯, ২২
সুমন্ত্র বসু ৪৬, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৬৮, ৮৩, ৯২
সুরেশচন্দ্র বসু (সেজোকাকাবাবু) ১৩-১৬, ৮৫
সেন্ট মরিৎস ৬৮
সোফিয়েনস্ট্রাসে ২৫, ২৯, ৬৮, ৬৯, ৭২
সোভিয়েত এলাকা ৯১
সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (S.P.D.) ৯৬
স্টাটবার্গেন ১
'স্টেটসম্যান' ১৫
স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ৫, ১১, ১৯, ৩৬, ৩৯, ৬২, ৬৪, ৬৬-৬৮, ৯৯

হরিপুরা ৬১
হরিপুরা ভাষণ ৬১
হরিবিষ্ণু কামাথ ১২
হারীন শাহ ৭৬, ৭৭
হিটলার ২৮, ৪৬, ৬৮
'হিন্দু' ৩৭
হিমাচল প্রদেশ ৫১
হিল কার্ট রোড ৪৯
হেডি ফুলপ-মিলার ৫৩, ৫৪, ৯১
হেলগে ওয়ার্থ ৬৮
হেলা শর্মা ৮৯, ৯০
হোম ইনটার্নড, হোম-ইন্টার্ন ৩৩, ৪৭
হ্যামলেট ৩৮

'An Outsider in Politics' ১৮
conte verde ৪৭
Gruner Baum ৪৬, ৫৭, ৫৮
'His Majesty's Opponent' ২৮
Letters to Emilie Schenkl, 1934-1942 ১৯
MV Victoria ৩৪
'Subhas and Sarat, An Intimate Memoir of The Bose Brothers' ৪৯, ৭৬, ৭৮
'The Bose Brothers: An Intimate Memoir' ৪৯, ৭৬
'The Gallant End of Netaji' ৭৭
'Thoughts on Vedanta' ৩৫